

হর্ষবর্ধন একডজন

শিবরাম চক্রবর্তী

স্নেহের তোতা কে
অনেক আদর সহ
ছুটকা দিদি-
১১/১/৬৩

হর্ষবর্ধন একডজন

শিবরাম চক্রবর্তী



পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
২য় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

HARSHABARDHAN EKDAJAN
by
Shibram Chakraborty

প্রচ্ছদ
অজয় ঘোষাল
অলঙ্করণ
শৈল চক্রবর্তী

মূল্য
১৮ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।



একডজন হর্ষবর্ধন-গপ্পো

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

যদ্দূর বেয়াড়া হতে হয়

সেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সবে তিনি কলকাতায় এসেছেন।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছি, হঠাৎ চারদিক থেকে একটা 'গেল! গেল!' রব শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। আরেব্বাস্!

চলমান এক পাহাড় ফুটপাথ জুড়ে বাস-এর মতই বেগে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর কি!

এক লাফে সরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় বাঁচিয়েছি।

ভদ্রলোক আমার সামনে এসে চিংপাত হয়ে পড়লেন ফুটপাথের ওপর।

বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে উঠতে পারছিলেন না, আমি তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

বললাম, 'এটা আমের সীজন্' জানেন? লোকে আম খেতে খেতে যায়, আঁটি আর খোসা ছড়াতে ছড়াতে যায় রাস্তায়। দেখে শুনে পথ চলতে হয় কলকাতায়—সব সময়ই, বিশেষ করে এই সময়টায় আরো।'

'হাসছেন আপনি? আমি খেলাম আছাড় আর আপনার হচ্ছে আমোদ?' রোষভরে তিনি বললেন।

'আজ্ঞে না। আমের সঙ্গে যেমনতর খোসা, তেমনি ঐ আমোদও জড়ানো। আম খেলে আমোদ হয়। আর খোসায় পা পড়ে পিছলে গেলেও এক রকমের আমোদ লাগে —অবশ্যি যে আছাড় খায় তার পক্ষে ঠিক আমোদের নয়, তা সত্যি। কিন্তু যেভাবেই খান না, আমের সঙ্গে আমোদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

'হুম্।' একটুখানি গুম হয়ে থেকে তিনি গুমরে উঠলেন আবার-'আমের সঙ্গে আরো কী কী জড়ানো আপনাদের এই কলকাতায়, শুনি একবার? জেনে রাখা ভালো আগের থেকে। সাবধানের বিনাশ নেই।'

'আমের সঙ্গে জড়ানো আমের আচার। আমের আছাড় খেতে খুব খারাপ হলেও আমের আচার খেতে কিন্তু খাসা। এমন উপাদেয়, এত চমৎকার উম্দা চীজ আর হয় না।'

'ভারী আমের খোশামোদ করছেন যে! আমের খোসা থেকে বুঝি আমোদ পেয়েছেন খুব?'

'আজ্ঞে না, মাপ করবেন। আপনার আছাড় খাওয়ায় আমি দু:খিত সত্যি। মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

'আমি হর্ষবর্ধন। আপনি?'

'আমি শিব্রাম।'

'বর্ধন?'

'আজ্ঞে না, বর্ধিত।'

'বর্ধিত? তার মানে?' তিনি একটু অবাক হন,—'সে আবার কি রকমের উপাধি? এই বর্ধিত?'

'যেমন রক্ষিত হয় না? তেমনি আর কি! রক্ষিতের মতই এই বর্ধিত। খেয়ে না খেয়ে বর্ধিত। কিছুটা নিজগুণে, কিছুটা পরের সৌজন্যে।'

থাকা হয় কোথায়?'



'যত্র তত্র। কলকাতার সব পাড়াতেই আমার আস্তানা। শহরের সব প্রান্তেই আমার মাসিমারা আছেন। আর আমার মাস্তুতো, মামাতো বোনরাই আমার প্রান্তসীমা। ঐ বোন পর্যন্তই আমার দৌড় মশাই! আর বলতে কি, বেশির ভাগ ঐ বোনের দ্বারাই আমি লালিত পালিত বর্ধিত।'

'আমরাও বন থেকে আসছি। আসামের বন থেকেই। সেখানকার বনাঞ্চলে আমাদের কাঠের কারবার। বিস্তর টাকা করার পর এখন টাকা ওড়াতে এসেছি এই কলকাতায়। আমরা আসামী।'

'জানি। আসামের বন থেকে টিয়ে পাখির আমদানি হয়। বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!—কথায় আছে। তা, কোথায় ওঠা হয়েছে আপনাদের এই কলকাতায়?'

'প্রথমে উঠেছিলাম রসা রোডে। সম্প্রতি চেতলায় একটা কাঠচেরাইয়ের কারখানা খুলেছি—সেইখানে আছি এখন। গোবরা বলল, গোবরা মানে আমার ভাই গোবর্ধন, সে-ই বলল, দাদা, এখানে একখানা ব্যবসা ফাঁদা যাক। শুধু শুধু কেন টাকা উড়িয়ে যাই? সেই সঙ্গে কিছু টাকা কুড়িয়েও যাই না কেন এখান থেকে?'

'হ্যাঁ, কলকাতার পথেঘাটে টাকা ছড়ানো!-বলে বটে। কুড়িয়ে নিলেই হয়।' সায় দিই তাঁর কথায়। 'আর চেতলাতেও আমার এক মাসি থাকেন। শালুমাসি।' আমি জানাই।

'আপনার চেতলার ঠিকানাটা দিন তো তাহলে। যদি কখনো কোনো কারণে দরকার-টরকার পড়ে....... এখানকার কারো সঙ্গে এখনো পর্যন্ত তো জানাশোনা হয়নি তেমন......'

তারপর একদিন হর্ষবর্ধন দেখি হাজির আমার চেতলার ঠিকানায়। ভাগ্যক্রমে শালুমাসির বাড়িতেই আমি ছিলাম সেদিন।

এসেই বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে মশাই! আমের থেকে আরেক দুর্ঘটনা হয়েছে, জানেন?'

'আছাড় খেয়েছেন নাকি আবার?'

'না, আমি নই। আমার ভাই। সে-ই!'

'তিনিই বুঝি আছাড় খেয়েছেন এবার?'

'না না, আছাড় খাননি। আমের আচারও নয়। আম খেয়েছেন খালি। আর তাই খেয়ে খেয়ে এখন আমাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'তাই বলুন! আমাশা? তা তো এখন হামেশাই হয়।'

'তাই হয়েছে। একটু জ্বরও হয়েছে তার ওপর। ডাক্তারের সঙ্গে জানাশোনা নেই আমার। তাই ডাক্তারের খবর নিতে এলাম আপনার কাছে।'

'চেতলায় তো রাম ডাক্তার। তিনি এখানকার সবচেয়ে নামজাদা।' আমি জানালাম-'যেমন নাম-ডাক, তেমনি হাতযশ।'

'তাঁকেই দেখাব তাহলে। তা, কোথায় থাকেন তিনি?'

ঠিকানা দিলাম।দিয়ে বললাম, 'ডাক্তার তো ভালোই, কিন্তু বড্ডো খামখেয়ালী। ওঁর চালচলন একটু অদ্ভুত। কিন্তু তাইতে ঘাবড়াবেন না যেন। রোগ আরাম করতে তিনি ওস্তাদ।'

'রোগ সারানো নিয়ে কথা। ডাক্তারের চালচুলোর খবর নিয়ে কি করব ?'

আমার কাছে রাম ডাক্তারের বাড়ির হদিস জেনে নিয়ে হর্ষবর্ধন তো গেছেন। গিয়ে চেম্বারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নেড়েছেন-'রামবাবু ডাক্তার বাড়ি আছেন? রাম ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন কি? ডাক্তার রামবাবু কি বাড়িতে রয়েছেন?'

তাঁর হেঁড়ে গলার হাঁকড়ানিতে একজন মুখ বাড়িয়েছেন-'কাকে চাই?'

'রাম ডাক্তারবাবুকে। রামবাবু ডাক্তারকে। ডাক্তারবাবু রামকে?' তিনি জানান।

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে যেতেই 'কী কেস?' প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁকে।

'না, কোনো কেস নয়।'জবাব দিয়েছেন হর্ষবর্ধন-'কেস থাকলে তো উকীলের কাছেই যেতাম। ডাক্তারের কাছে আসব কেন?'

'মানে, হয়েছেটা কি?'

'আজ্ঞে, আমাশা। তার ওপরে একটুখানি জ্বরের মতও আবার।'

'নিন শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন চট্ করে।' আর একটি কথাও তাঁকে কইতে না দিয়ে কোনো আপত্তি গ্রাহ্য না করে ধরে বেঁধে তাঁকে বেঞ্চির ওপরে শুইয়ে দেয়া হয়।

তবুও শুয়ে শুয়েই তিনি প্রতিবাদ করতে যান। কিন্তু তাঁর কথায় কান না দিয়ে তাঁর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দেওয়া হয় তারপর।

তারপরেও থার্মোমিটার মুখে করেই তিনি মুখ নাড়তে যান, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে দারুণ বাধা আসে।

'না না! আর একটিও কথা নয়। চুপটি করে শুয়ে থাকুন। আপনার জ্বরটা দেখা যাক আগে।'

তথাপি তিনি একটু বাঙনিস্পত্তির চেষ্টা করেন- 'ম্-ম্-ম্-মাজ্ঞে.......!'

'জ্বরের কাঠি মুখে নিয়ে কথা বলতে যাবেন না। ওটা ভেঙে গেলে, ভাঙবার পর যদি গিলে ফ্যালেন, ভেঙে গিয়ে যদি পেটের মধ্যে চলে যায়, তখন একেবারে ডাক্তারের একতিয়ারের বাইরে চলে যাবে। সার্জনের দরকার পড়বে তখন। পেট কেটে বার করতে হবে ঐ থার্মোমিটার। অতএব, সাবধান! একটি কথাও নয় আর।'

অসহায়ভাবে শুয়ে থাকেন হর্ষবর্ধন।

'আমাশা হয়েছে বললেন না? আমাশা? সাদা আমাশা, না রক্তামাশা?'

থার্মোমিটার মুখে নীরবে ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন- কি বোঝাতে চান তিনিই বোঝেন।

'আমাশায় তো এমিট্রিন ইন্জেক্শন দেয় জানি। দেখি, দেরাজের কোথাও আছে কিনা দাবাইটা।'

ওষুধের আলমারির ভেতর থেকে এমিট্রিনের অ্যাম্পিউলটা বার করে ইন্জেক্শনের সিরিঞ্জে ভরা হয়।

মুখটি বুজে জুলজুল করে তাকিয়ে দ্যাখেন হর্ষবর্ধন।

'দেখি হাতখানা।'

হর্ষবর্ধনের হাতখানা করায়ত্ত করে তাঁর বাহুমূলে সিরিঞ্জের ছুঁচটা বাসানো হয়। হর্ষবর্ধন থার্মোমিটার মুখে গোঁ গোঁ করেন। কী আর করবেন?

'উঁহু উঁহু! নড়বেন না। স্থির হয়ে থাকুন। ইন্জেক্শনের সময় নড়াচড়া করতে নেই।

সিরিঞ্জের ছুঁচ ভেঙে যদি ভেতরে থেকে যায়, সে আবার আরেক ফ্যাসাদ। তার জন্যে সার্জন ডাকতে হবে না অবশ্যি, ছুরি চালিয়ে আমিই বার করতে পারব। কিন্তু কাটাকুটির হাঙ্গামা আছে ত! কম হয়রানি নয়।'

অগত্যা হর্ষবর্ধনকে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে থাকতে হয়।

ইন্‌জেক্‌শনটা ঠুকে দেবার পর সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে ওঁর মুখ থেকে জ্বরকাঠিটা খুলে নেওয়া হয়।

থার্মোমিটারটা মুখের বার হতেই হর্ষবর্ধন হাঁ করেন। হাঁপ ছাড়েন। হাই তোলেন।

সেই ফাঁকে একটা ইয়া ওষুধের গুলি তাঁর মুখগহ্বরে ফেলে দেওয়া হয়-'নিন, গিলে ফেলুন চট্‌ করে। ওষুধটা পেটে গেলে উপকার হবে।'

'ছি ছি ছি! কী বিচ্ছিরি ওষুধ! মুখটা তেতো হয়ে গেল আমার! কী দিলেন আপনি? বিষ?'

'কেন্‌, কুইনিন কখনো খাননি নাকি? জ্বর হলে কি খেতে দেয়? কি খেলে জ্বর আটকায় জানেন না? তাই দিয়েছি।'

'গলায় আটকে গেছে আমার। গলার থেকে তলা পর্যন্ত সব তেতো হয়ে গেছে। জিভের ওপরতলা নিচেরতলা সব।'

বিচ্ছিরি মুখ তাঁর আরো বিচ্ছিরি আকার ধারণ করে।

'না, জ্বরটর নেই এখন।' থার্মোমিটার পরীক্ষা করে তিনি জানান-'যাক, তাতে অবশ্যি কোনো ক্ষতি হবে না। জ্বর সারাতে যেমন, আটকাতেও তেমনি-এই কুইনিন। রোগের প্রতিষেধ রোগ সারানোর চাইতে ভালো, জানেন তো? এখন বলুন তো, কি বলতে চাইছিলেন আপনি?'

'বলতে চাইছিলুম যে, জ্বর আর আমাশা আমার হয়নি-হয়েছে আমার ভাইয়ের। আমি আপনার রোগী নই।'-মুক্তিলাভ করার পর মুখ ফুটল ওঁর।

'আপনি রোগী নন?'

'আজ্ঞে না।'

'যাক্ তাতে আর কি হয়েছে? আমিও কোনো ডাক্তার নই। ভাববেন না।'

হর্ষবর্ধন শুনে হতবাক্ হন : 'সে কি! আপনি রামবাবু ডাক্তার নন? রাম ডাক্তারবাবু নন আপনি? অ্যাঁ? আপনি কি ডাক্তার রামবাবু নন নাকি?'

'আজ্ঞে না। ডাক্তারবাবু কাছেই কোথায় কি একটা কাজে বেরিয়েছেন। আমায় বসিয়ে রেখে গেছেন চেম্বারে। আর বলে গেছেন কোনো রোগী-টোগী এলে তার দেখাশোনা করতে।'

অ্যাঁ? আপনাকে বলে গেছেন রোগী দেখতে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই আপনাকে আমি দেখেছি। উনি যেমন যেমনটি করে দেখে থাকেন, আমিও ঠিক তাই তাই-ই করেছি। আমাশায় উনি এমিট্রিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে থাকেন আমার নিজের চোখে দেখা-আমিও তাই ঠুসে দিয়েছি আপনাকে।'

'ঠুসে তো দিয়েছেন, এখন আমার যদি কোনো ক্ষতি হয়? তাহলে?'

'ক্ষতি আর কি এমন হবে! মারা তো যাননি, দেখতেই পাচ্ছি। ঐ ওষুধে বড়জোর আপনার রক্তামাশা হতে পারে নাহয়।'

‘যদি কোনো শক্ত রোগ হয় আমার ?’-হর্ষবর্ধন রীতিমত বিপন্ন বোধ করেন।

‘রোগ হলে তো ডাক্তারবাবু রয়েছেনই!’ লোকটি অম্লানবদনে আশ্বাস দেয়- ‘সব রকম রোগ আরাম করতে আমাদের রাম ডাক্তারের জোড়া হয় না, এ তল্লাটে তিনি অদ্বিতীয়।’

বেখাপ্পা কথাবার্তায় বিষম খাপ্পা হয়ে হর্ষবর্ধন শুধোন, ‘কিন্তু আপনি কে মশাই, শুনি একবারটি? বলা নেই কওয়া নেই, ধরে বেঁধে শুইয়ে মুখে থার্মোমিটার পুরে দিয়ে ইয়া লম্বা এক পিচকিরি দিয়ে কি একটা কান্ড করলেন বলুন ত? কে আপনি?’

‘আমি ডাক্তারবাবুর বেয়ারা।’ বলল সেই লোকটা- ‘তাঁর ওষুধপত্রের ব্যাগট্যাগ আমিই বয়ে বেড়াই।’

‘কৃতার্থ করেন! কিন্তু এই যে কান্ডটা করলেন, এটা কি আপনার উচিত হোলো বলুন? বেয়ারা হয়ে এই ডাক্তারি করাটা.......?’

‘কেন নয় বলুন আপনি? ভৃত্য হয়ে মনিবের স্বার্থ দেখা কি আমার কর্তব্য নয়? আমি যদি রোগ না বাড়াই তো ডাক্তারবাবু তাহলে সারাবেনটা কি?’

‘তা তো বুঝলুম! কিন্তু এই যে এখন আমার মাথা ঘুরছে, হতে-পা কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে, গা বমিবমি করছে-তার কি হবে? আমি অজ্ঞান হয়ে যাব বোধহয়। আমার পক্ষাঘাত হয় কি না কে জানে!’

‘একটুখানি ঠান্ডা জল খান, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন এক্ষুণি। এই নিন খেয়ে ফেলুন দেখি ঢক ঢক করে ....না, না, ভয় নেই, কোনো ওষুধবিষুধ মেশানো হয়নি-খাঁটি জল। কর্পোরেশনের কলের।’

জল খেয়ে হর্ষবর্ধন সন্দেহ প্রকাশ করলেন- ‘খাঁটি জল বলছেন? ওষুধবিষুধ কিছু মেশাননি বলছেন? কিন্তু কলের জল তো এমন মিষ্টি হয় না।

‘একটুখানি গ্লুকোজ-ডি মিশিয়ে দিয়েছি কিনা! সরবতের মতই খেতে, তাই না? এটা খেয়ে গায়ে বল পাবেন। আমি তো হরদম্ খাই মশাই!’

উদাহরণস্বরূপ শ্রীমান্ বেয়ারা আরেক গ্লাস ঐ পানীয় তাঁর সামনেই পান করে।

তারপর হর্ষবর্ধন টলতে টলতে আমার কাছে আসেন। এসে কাতরান- ‘আমাকে একটা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ঠিকানা বাতলান তো মশাই!’

‘কেন, কি হয়েছে?’

‘হোমিওপ্যাথিতে কোনো ইন্‌জেক্‌শন ফিন্‌জেক্‌শন নেই তো?’

‘তা তো নেই, কিন্তু কেন?’

‘তার এক ডিসপেনসারি ওষুধ গিললেও কিচ্ছু হয় না। আকি একবার বাবার বাক্সভর্তি সব হোমিওপ্যাথি ওষুধ একটা গেলাসে ঢেলে একসঙ্গে গুলে খেয়ে ফেলেছিলাম-কিচ্ছু হয়নি আমার।’

‘কিচ্ছু হয়নি? বলেন কি?’

‘একেবারে কিচ্ছু হয়নি, তা অবশ্যি বলা যায় না। বাবার গালমন্দ চড়চাপড় যা হবার তা হয়েছিল’-হর্ষবর্ধন অকপটে অপ্রিয় সত্য বিবৃত করেন- ‘কিন্তু তাতে আমার এমন ধারা সর্বনাশ হয়নি।’

‘কি সর্বনাশটা হোলো শুনি তো?’

‘এখনো হয়নি, কিন্তু হবে নির্ঘাত! হতে বসেছে। আসন্ন বলতে পারেন।’

'কি আসন্ন বলুন না মশাই!' আমি ব্যগ্র হয়ে উঠি।

কলেরা কি পক্ষাঘাত, একটা কিছু হবেই আমার। আরম্ভ হয়েছে। হোলো বলে। আমার গা-হাত পা কাঁপছে, গা বমিবমি করছে, মাথা ঘুরছে! চোখের সামনে অন্ধকার দেখছি!'-হর্ষবর্ধন অর্ধনিমীলিতনেত্রে বসে পড়েনে।

'ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলে বলুন না! রাম ডাক্তারের কাছে গেলেন ত........তারপর?'

তারপর রাম ডাক্তারবাবু ওরফে রামবাবু ডাক্তার ওরফে বাবু রাম ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে বাড়াবাড়ি যা হয়েছিল, তার আদ্যোপান্ত জানা গেল তাঁর কাছে।

শুনে আমি তাজ্জব!

'রামবাবু একজন বেয়াড়া ডাক্তার, তা আমি জানতাম। কিন্তু রামবাবুর বেয়ারাও যে এক ডাক্তার তা তো আমার জানা ছিল না। এ তো ভারী বেয়াড়া ব্যাপার!'- আমি বলি।

'হ্যাঁ, যদ্দূর বেয়াড়া হতে হয়!' বলেই হর্ষবর্ধন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন আমার সম্মুখে।



হর্ষবর্ধনের দিকদর্শন

হর্ষবর্ধন তাঁর বাল্যকালের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সেদিনের খবরকাগজটা পড়েছিল সামনে, তাই থেকেই উঠল কথাটা।

তিনি কাগজের একটা জায়গা আমাকে দেখালেন।-

না, সেখানে তাঁর বাল্যবৃত্তান্ত ছিল না, মহামনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনকথার উল্লেখ রয়েছে দেখলাম।

রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে পনের বছর বয়সেই তিনি দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি দার্শনিক।

'সেদিক দিয়ে আমি তাঁর থেকে পাঁচ বছর এগিয়ে।' হর্ষবর্ধন আমাকে জানালেন, 'দশ বছর বয়সেই দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয়।' বললেন তিনি সহর্ষে।

কথাটা শুনেই আমার তাক লাগে, তাঁর দিকে তাকাই! আমার মুখে কোনো কথা সরে না। অবাক হয়ে তাঁকে দেখি।

তিনিই তখন আমার কাছে দর্শনীয়।

'কী করে এই পরিচয়টা ঘটলো বলি তাহলে, শুনুন।' তিনি বলতে থাকেন : 'তখন আমি মামার বাড়ী শিলঙে। সেখানে থেকে পড়াশুনা করি ইস্কুলে।

মামা সরকারী চাকুরে। সাড়ে নটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়েন আপিসে। রোজই তাই। আর ফেরেন সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

আর আমি সাড়ে দশটায় যাই। ফিরি সাড়ে চারটেয় ছুটি হবার পর।

সেদিন কিন্তু মামার কান্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাড়ে নটা বেজে গেছে তবু কিন্তু তাঁর আপিস যাবার কোনো তাড়া দেখা গেল না। দশটা বাজলো, তবু তিনি চানটান সারা দূরে থাক্, একখানা মোটা বই হাতে নিয়ে আরাম করে নিজের বিছানায় গড়াচ্ছেন!

ব্যাপারটা আমায় বেশ নাড়া দিল বলতে কি! এমন বিসদৃশ দৃশ্য কখনো দেখা যায় না। দশটা বাজে, আর মামা আপিসে না গিয়ে বাজে বই নিয়ে বিছানায় আয়েস করছেন ভাবতেই পারা যায় না এমনটা।

মামীমাকে খবরটা দিতে আমি রান্নাঘরের দিকে দৌড়ালাম।..... 'মামিমা! ও মামিমা!!'

'রান্না হয়নি এখনো।'

'না না, সেকথা নয়.....'

'হলে ডাকবখন তোমায়।'

'খেতে আসিনি আমি। খাবার কথা বলছি না।'

'ওই চন্দ্রপুলির মতলবে এসেছ বুঝি? বুঝেচি। তাকের দিকে তাকালেই এক ঘা খাবে। হাত বাড়িয়েছ কি, দেখেচ ত? এই খুঁন্তির এক ঘা.....বুঝলে?'

তাকের দিকে তাকাচ্ছি না আমি। চন্দ্রপুলির তাকেও আসিনি ... মামার কথাটা বলতে এসেছিলাম.....।'

দেব তোমায় চন্দ্রপুলি....এখন না.....বিকেলে..... ইস্কুল থেকে ফিরে এলে.....'

'সেজন্যে আমি আসিনি, বলছিনা?'

'কী জন্যে এসেছে শুনি তাহলে? আমার সাত জন্মের শত্তুর!'

'মামা এখনো আপিসে বেরয়নি।'

'না, বেরয়নি।'

'গড়াচ্ছে নিজের বিছানায়।'

'কেন, বিছানায় না গড়িয়ে মাটিতে গড়াবে নাকি?'

'কখন যাবে তাহলে আপিসে?'

'যাবে না।'

'কেন যাবে না মামীমা?'

'তাতে তোমার কী?'

'জানতে চাইছিলাম এমনি।'

'সে খবরে তোমার দরকারটা কী শুনি একবার?'

'এমনি জানতে চাইছিলাম। ইচ্ছে করে না জানতে?'

'আপিসে থেকে উনি ছুটি নিয়েছেন এক হপ্তার।'

'পুরো এক হপ্তার ছুটি?' শুনে তো আমি হতবাক! 'এক সপ্তাহ ধরে উনি আপিস যাবেন না, কাজটাজ কিচ্ছু নেই কোনো, শুধু বাজে বই পড়া আর বিছানায় গড়ানো... বলো কি মামীমা? আরাম করে বেশ মজায় শুয়ে শুয়ে কাটাবেন এই সাতদিন?'

'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কিনা, ছুটি নিয়েছেন তাই।'

'মোটেই খারাপ দেখাচ্ছে না মামাকে। বেশ ভালোই রয়েছে শরীর। দিব্যি আছেন। আমি দেখলাম।'

আমার দিব্যদর্শনের কথাটা আমি দিব্যি গেলে জানলাম। কিন্তু মামীমা আমার কথায় কান দিলেন না-'বাহির দেখে শরীরের কিছু বোঝা যায় না রে। বাইরে খারাপ না দেখালেও ভেতরে ভেতরে খারাপ হতে পারে শরীর।'

'মামার কোনো অসুখ করেছে আমি বিশ্বাস করি নে।' আমি স্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করি-'মামার কখনো কোনো অসুখ করতে পারে বিশ্বাস হয় না আমার। ঐ চেহারা! অসুখ কখনো মামার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে নাকি? কোনো অসুখের বাবার সাধ্য নেই।'

'তুমি এখান থেকে যাও তো এখন। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। ভাত রান্নাই বাকী। তোমাকে খেতে দিতে হবে, ইস্কুলে পাঠাতে হবে-কতো কাজ!'

'অসুখের ছলনা করছেন মামা। একদম কোনো অসুখ করেনি.....' বলতে গিয়েই ধাক্কা খাই।

ঘাড়ধাক্কা!.....'একদম কোনো অসুখ করেনি? অসুখের ছলনা করছি! বটে!' ঘাড় ধরে মামা রান্নাঘরের বার করে আনেন আমায়। আবার যদি তোমার মুখে এ ধরনের কথা শুনি তাহলে এক থাপ্পরে ত্রিভুবন অন্ধকার করে দেব। ইয়ার্কি পেয়েছো?'

কথাটা আমার কানে লাগে-কানমলে লাগিয়ে দেন মামা। প্রাণে যে লাগে তা না বললেও চলে। 'দূর হয়ে যা আমার সামনের থেকে।'

আরেক ঘাড়ধাক্কায় আমি একেবারে সদর রাস্তায়।

আমার বন্ধু পলির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

'কিরে! ইস্কুল যাবিনে?' আমার চোট সামলে সে শুধোয়।

'আলবৎ যাব।' আমি বলি, 'ইস্কুল না গিয়ে রক্ষে আছে?'

'আমি যাচ্ছিনে।'

'কারণ?'

'কারণ একটা লম্বা কবিতা। সেটা ঝাড়া মুখস্থ বলতে হবে আজ। এদিকে ওটা মুখস্থই হয়নি আমার। এক স্ট্যান্‌জাও না।'

চকোলেটের একটা ভগ্নাংশ মুখস্থ করতে করতে সে জানায়।

'মুখস্থ হয়নি একদম?'

'কই আর হোলো! একটানা অত বড়ো পদ্য কারো মুখস্থ হয় নাকি? করতে পারে কেউ? তাছাড়া সময়ই পাইনি মুখস্থ করার। করব কি!'

'ইস্কুল যাবি আবার কী করবি!'

'হ্যাঁ, ইস্কুলে যাই আর থার্ডসারের রুল্‌পেটা খাই! মরে যাই আর কি!'

'ওই যা! কবিতাটার কথা তো আমি ভুলেই গেছি ভাই রে! মনেই ছিল না আমার। কী হবে!' খাবার আগেই যেন রুলের ঘা আমার মাথায় লাগে- 'কী হবে! -থার্ড টীচার যে ভারী কড়া মাস্টার ভাই!'

'তাই তো আমার পেট কামড়াচ্ছে এখন থেকেই।' পলি জানায়: 'এখনো বলিনি মাকে। বললে পরে খেতে দেবে না, সাবু বার্লি খাইয়ে রেখে দেবে সারাটা দিন। ভাত খাবার পর পাড়ব কথাটা।'

'তাই তো, কী করি এখন-বল্ তো!' আমি ভাবনায় পড়ি।

'পেট কামড়াতে পারিস তুইও!' সে বাতলায়।

'নিজের পেট নিজে কামড়াবো, তুই বলছিস্?'

'নিজের পেট কেউ কামড়ায়? কামড়ানো যায়? কামড়াতে পারে কেউ? অবাক করলি বাবা!' পলি বলে- 'পেট তো নিজের থেকেই কামড়ায় রে! যখন খুসি কামড়ায়। যাকে খুসি! এই যেমন কামড়াচ্ছে আমার এখন।'

আমার পেট কামড়ালেও নিস্তার নেই। যেতেই হবে ইস্কুলে। গেলে পরে থার্ড টীচারের মার, আর বাড়ীতে বসে থাকলে মামার ধুন্ধুমার! মামা আজ সারাদিন বাড়ি থাকবে কিনা! এখন সাতদিন ধরে থাকবে।'

আমার উভয় সঙ্কটের কথাটা ব্যক্ত করি। খাইবার পাশের সঙ্কট পার হয়েই না হয় পাড়লাম কথাটা। খাবার দাবার সারবার পরেই পেট কামড়ানির আমদানি করা গেল না হয়। কিন্তু মামা? মামার পাশ কাটাবার উপায়?

'মাস্টারের মারের চেয়ে মামার মার ঢের ভালো।'

'আমার মামার মার কখনো খেয়েছিস?' আমি জিগ্যেস করি।



'কবে আর খেলাম! তোর মামার ত্রিসীমানাতেই যাইনি কখনো। নিজের মামারই মার খাইনি! মামাই নেই ভাই আমার!'

'বেঁচে গেছিস বেজায়।' ওর প্রতি আমার হিংসে হয়।

'তোর বরাতকে আমি হিংসে করি বরং! মারধোর করেও যদি আমার একটা মামা থাকতো, কী ভালোই যে হোতো রে! মামার বাড়ি যেতে পেতাম কেমন! তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই.....' সে ছড়া আওড়ায়।- 'মামীর আদর খেতাম কেমন!'

'ইস্কুলে না গেলে তোর বাবা কিছু বলবে না?'

বাবা বাইরে গেছে ডিউটিতে। দিন সাতেক পরে ফিরবে। সাত দিনের জন্যে নিশ্চিন্তি। ইচ্ছে করলে সাতদিনই আমার পেট কামড়াতে পারি.....'

'সাতদিনই পেট কামড়ায় নাকি কারো?'

'দাঁত কন্‌কন্‌ মাথা ঝন্‌ঝন্‌-পিঠ টন্‌টন্‌-এসব আমি ইস্টকে রেখেছি। ছাড়বো আস্তে আস্তে।'

'ইস্টকের মতই ছাড়বি? যার মাথায় লাগে লাগুক!' ওর কথায় আমার হাসি পায়। যদিও ওর ওই সাতদিনের নিশ্চিন্তিতে আমার বেশ ঈর্ষা হতে থাকে বলতে কি! আর এই সাতদিনই আমার দুর্ভোগ! বাড়ির থেকে মামার নট্ নড়ন চড়ন!'

'তোর মা কিছু বলবে না?'

'মা আমাকে খাইয়ে দাইয়েই মাসির বাড়ি যাবে আজ বেড়াতে। ইস্কুলের জন্যে তাড়া লাগাবার কেউ থাকবে না আর। আর, বলেছি তো, খাবার পরেই আমার পেট কামড়াবে। দারুণ কামড়াবে।'

'আর তোর মা যদি দুপুরে হঠাৎ ফিরে এসে দেখতে পায় যে তুই যাসনি আজ ইস্কুলে? বাড়িতে বসে রয়েছিস? বলে দেবে না তোর বাবা এলে?'

'আমার মা সেরকম না। বাবাকে এসব কথা লাগাতে যায় না কখনো।'

'আহা!' আমার মামীর বদলে তোর মাকে যদি পেতাম রে!' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি।

চানটানের পালা সেরে চেটেপুটে সব খাবার পর এঁটো থালার ওপরেই আমি মুখ থুবড়ে পড়লাম।

'কী! হোলো কি আবার?' গর্জে উঠলেন মামীমা।

'উঃ! আঃ! উঃ! মারা গেলাম।' গোঙাতে লাগলাম আমি।

'আদিখ্যেতা হচ্ছে?'

'পেট কামড়াচ্ছে যে! আমি কী করব!' কাৎরে উঠি আমি : এমন যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে যে.....! আর আমি বলতে পারি না। উ:! আ:! উ:! যত অব্যয় শব্দ ব্যয় করে জানাতে হয়।

'অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মামীমা! সইতে পারছি না আমি।' সেইখানেই আমি শুয়ে পড়লাম।

আমার কাতরোক্তি ওঘরে মামার কানে গেছল বোধ করি।-'কী! হয়েছে কি ওর?' সেখান থেকেই তিনি প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'পেট কামড়াচ্ছে ছেলেটার।'

'পেট কামড়াচ্ছে? ছোঁড়াটাকে পাঠিয়ে দাও এখানে। আমি দুমিনিটে ওর পেটের ব্যথা সারিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

'যা তোর মামার কাছে। ভালো ওষুধ আছে,-দেবে'খন।'

যোয়ানের আরক ফারক....

যোয়ান বলতে মামাকেই মনে হয় আমার। আরক কী জিনিস জানিনে, তবে যোয়ানের সঙ্গে মামার বিশেষ ফারাক নেই। তা জানি।

ভয়ে ভয়ে এগুতে হল আমায়।

'কিরকম কামড়াচ্ছে দেখি? দেখি পেটটা?' হাঁকড়ান মামা।

'বাহির দেখে কি ভেতরের কিছু বোঝা যায় মামা? দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে আমার?'

তারপর দেখি কি, মামা একটা টাটকা টিনের বাক্স খুলে বিস্কুট মুখে তুলে যাচ্ছেন-একটার পর একটা।

দেখেই না আমি পেটের যন্ত্রণা ভুলে গেছি। গোঙানি ছেড়ে হাত বাড়িয়েছি বিস্কুটের দিকে-'একখানা দাওনা মামা আমায়!'

'হতভাগা ছেলে! এই তোমার পেট কামড়াচ্ছে! বিস্কুট কামড়াতে পেলে আর পেট কামড়ায় না বুঝি! মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া!'

বলেই না মামা হাতের মোটা বইখানা ছুঁড়ে মেরেছেন আমায়। লাগসই তাক্ বলতে হবে, তার ধাক্কায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছি তৎক্ষণাৎ!

'নিয়ায় বইটা!'

শুনেই না, পাছে আমাকে আর এক ঘা তার খেতে হয় আবার, তাই বইটা নিয়েই আমিই উধাও হয়েছি বাইরে।

বাইরে গিয়ে দেখি, সেটা আর কিছু নয়, একটা অঙ্কের বই কেবল।

'অঙ্কের বই?' আমি অবাক হয়ে শুধোই। অঙ্কের বই পড়ে কেউ অবসর বিনোদন করে আমার জানা ছিল না।

'হ্যাঁ, আঁকের বই? যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের কথাই লেখা ছিল বইটায়, সূচীপত্র পড়ে যা বোঝা গেল। আঁকের বই আবার দর্শনের বইও বলা যায়! সেই প্রথম আমার দর্শনের সঙ্গে পরিচয়। সেই ধাক্কায়।'

'কী নাম ছিল বইটার?' আমি জিগ্যেস করি।

'পাতঞ্জলের যোগদর্শন।' জানান আমায় হর্ষবর্ধন।

যোগটোগ মানে আঁকফাঁক নিয়ে কোনো দার্শনিক বই হবে হয়ত। তবে পাতঞ্জল যে, সেবিষয়ে কোনো ভুল নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'তার ধাক্কায় আমি পপাত হয়ে গেলাম না? বলছি তাই। আরেকবার ঐ বইয়ের চোট খেলে আর উঠতে হোতো না আমাকে-নিপাত হয়ে যেতাম।'

'কী ছিল বইটায়, পড়ে দেখেছিলেন?'

'সূচীপত্র দেখে আমার হয়ে গেছল। অষ্টাঙ্গ যোগের কথা লেখা ছিল সূচীতে। বলে একরকমের যোগ কষতেই যা হিমশিম খাই, তার ওপরে আবার আট রকমের যোগ! চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম, তারপরে ওই দুর্ভেদ্য বইয়ের ভেতরে আর আমি পা বাড়াই-সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে?'

'ভেতরেই গেলেন না, তাহলে আর দর্শনশাস্ত্রের পরিচয়টা পেলেন কী!'

'যা পেয়েছিলাম তাই ঢের। তাতেই মাথা ঘুরে গেছল আমার। আরেকটু হলে বেকায়দায় আছাড় খেয়ে পড়লে হাত-পায়ের হাড় ভাঙত। হাতটা ছড়ে গেছল। মাথার পেছনটা ফুলে উঠেছিল ঢাউস হয়ে-সেই বইয়ের চোট খেয়েই। দর্শন বস্তুটা কী তখনই আমি টের পেয়ে গেলাম।'

'টের পেয়ে গেলেন?'

'পেলাম বইকি। হাত পা-র হাড় ভাঙলে হাড়ে হাড়ে টের পেতাম। তখনই আমি বুঝেছি যে দর্শনের কাজ হচ্ছে মগজে ঘা মারা- মাথার ঘিলু এদিকে ওদিক করে দেওয়া। সহজে আর এশর্মা ওদিকে এগুচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, বলতে হবে যে, রাসেল সাহেবের পাঁচ বছর আগেই আমি দর্শনের পরিচয় পেয়েছি। এটা আমার দিব্যদর্শনও বলতে পারেন।'

'দিব্যদর্শন বলছেন আপনি?'

'বলছিই ত! বলবই ত! মোটা বইখানার মলাটে গোটা গোটা হরফে ছাপানো ছিল—পাতঞ্জলের যোগদর্শন। দিব্যি আমি দেখলাম। এই স্বচক্ষে। তারপরে সূচীপত্র ভেদ করে ভূমিকাতেই ঐ অষ্টাঙ্গ যোগের কথা না দেখেই আমি আর এক পাও এগোইনি! তারপরেও, মানে ঐ আট রকমের যোগের ওপরেই বাইশ রকমের বিয়োগ, আটষট্টি রকমের গুণ আর ছিয়াত্তর রকমের ভাগ ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু ঐ দর্শনেই আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছিল যে অত যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ আমার ভাগ্যে নেই। ওসবের ধারে কাছে থাকা আমার চলবে না। দারুণ শির:পীড়া নিয়ে ইস্কুলের পাট চুকিয়ে তারপরেই আমি ফিরে এলাম বাড়িতে। পৈতৃক কাঠের কারবারে লেগে গেলাম। আপনাদের ভাষায় একটা গোমুখ্যু আকাঠ হয়ে রইলাম আর কি!'

'না না! কে বলছে আপনাকে আকাঠ? বলেছি আমি?' আমার প্রতিবাদ।

'না বলুন! কিন্তু আমি বলব, দার্শনিক হিসেবে ঐ রাসেল সাহেব আমার কাছে নেহাত ছেলেমানুষ। অন্তত: পাঁচ বছরের ছোট আমার চাইতে।'



হর্ষবর্ধনের পাঠশালা

তোফা খানাপিনায় রবিবারের দিনটা খাসা কাটানো যাবে আশা করে হর্ষবর্ধনের আস্তানায় হাজির হলাম। গিয়ে দেখি কি, তিনি গোমড়া মুখ নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

'একি! মাথায় হাত দিয়ে বসে কেন? তার ওপর নিজের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন আবার!' আমি বললাম একটু অবাক হয়েই, 'বড় লোকদের মাথায়, জানি তো, পরলোকরাই হাত বুলিয়ে থাকে।'

'পরলোক?'

'হ্যাঁ। মানে, অপর লোকরা। যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তারাই এসে মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা কড়ি নিয়ে কেটে পড়ে।'

'একজন অবশ্যি সকালে এসেছিলেন, মাথায় হাত বোলাবার জন্যে কিনা জানি না।' তিনি জানালেন, 'তবে তাঁকে পরলোক বলা যায় না ঠিক, ব্যাকরণে ভুল হয়। আবার পরীলোক বলতেও বাধে। বয়েসকালে কদাচ পরী ছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু এখন তিনি বেশ পরিণত বয়সী।'

'কী জন্যে এসেছিলেন তিনি?'

'ভদ্রমহিলা বললেন যে এই এলাকায় শিশুদের জন্য তিনি একটা কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল খুলতে চান। সেই ইস্কুলের উদ্বোধন সভার পৌরোহিত্য করবার জন্য বলছিলেন আমায়।'

'পৌরোহিত্য! সে তো পৌরপিতাদের কাজ মশাই! তাঁদের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আমি আপনি কেন?'

'আমিও বলেছিলাম সেই কথা। বলেছিলাম যে পৌরশিশুদের তো পৌরপিতারই যথার্থ অভিভাবক..... তা তিনি শুনছেন না, বলছেন যে, পৌরপিতাদের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁরা সবাই ভারী ব্যস্ত এখন, আপনাকেই উদ্বোধন সভার পুরোহিত হতে হবে।'

'তা, আপনি কী বললেন?'

'বললাম যে, আপনার ইস্কুলের যদি হিত করার কিছু থাকে-মাস্টারি-টাস্টারি আমার দ্বারা হবার নয়, সে সব বাদ দিয়ে যদি টাকা কড়ি দিয়ে এই হিতচেষ্টায় আমি কোনো সাহায্য করতে পারি—তা আমি পুরোপুরিই করব। কিন্তু আপনার ঐ পুরোহিত হতে পারব না।'

'টাকা কড়ি দেবেন সে আর বেশী কথা কি! তা আমরা ভালোরকম জানি। আর তা নেবও আমরা। তবু কিন্তু আমাদের ইস্কুলের উদ্বোধন সভায় পুরোহিতও হতেই হবে আপনাকে।—তিনি জানালেন।'

'তারপর আপনি কী বললেন ?'

'আমি পুরুৎ হব কি করে? বামুন নই, মন্তর-ফন্তর কিছু জানি নে..... বলেছি আমি—বলতে গেছি—কিন্তু উনি সে কথা কানেই তুললেন না। বললেন মন্তর ফন্তর কিছু নেই, শুধু উদ্বোধনী ভাসান দিলেই হবে।'

'ভাসান?'

'তাই ত বললেন। অবশ্যি ভাসানের অভিজ্ঞআমার আছে খুব—কৈশোরকালে আর জৈায়ান বয়সে অনেক ঠাকুর ভাসান দিয়েছি, দেদার দূর্গাপ্রতিমা আর সরস্বতী ঠাকুর কাঁধে করে বয়ে নিয়ে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে ঐসব কাজ এই বেতো কাঁধে আর পোষাবে না। মশাই! দেখুন দিকি, কী ফ্যাসাদ!'

'না না, সেসব কিছু না।' আমি অভয় দিলাম, 'ভাসান নয়, ভাষণ। উনি ভাষণের কথাই বলেছেন। তার মানে, শুধু বক্তৃতা দিতে হবে আপনাকে। ভয় পাবার কিছু নেই।'

কিন্তু উনি সত্যিই ভয় খান এবার, 'ও বাবা! বক্তৃতা! তাহলেই আমি গিয়েছি। দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারি না—আমি দেব ভাসানের বক্তৃতা! তাহলেই হয়েছে। আমি বরং আজ রাত্রেই গাঁয়ে ফিরে যাই—আমাদের সেই আসামের জঙ্গলে। গাছের ডালে চেপে লুকিয়ে বসে থাকি গে।'

'ভাষণ দিতে পৌরপিতাদের পাওয়া যাচ্ছে না! আশ্চর্য!' আমি অবাক হই : 'ওঁরা সব গলাবাজি করার জন্য পা বাড়িয়ে থাকেন বলে শুনি— তার ছুতো খুঁজে বেড়ান সব সময়। আর তাঁদেরই নাকি পাওয়া যাচ্ছে না! একজনকে না পাওয়া গেলেও আরেক জনকে যেত।'

নিশ্চয়! পৌরপিতা আবার পাওয়া যায় না খুঁজলে পরে?' পাশেই বসেছিল তস্য ভ্রাতা শ্রীমান্ গোবর্ধন—সে টিপ্পনি কাটল, 'পৌরপিতা তো ঘরে ঘরেই!'

ঘরে ঘরেই পৌরপিতা ?' আমার চমক লাগে ওর কথায়: 'যতই হোক্, পৌরপিতারা এতটা অবিরল নয় বোধ হয়।'

'নেই? ঘরে ঘরেই ছেলেপুলে নেই কি? যেখানে ছেলেপুলে আছে, সেইখানে তাদের পিতা টিতাও রয়েছে। আর তারা, বেশির ভাগই বলতে গেলে, পৌর দশায় এখন। জোয়ান বয়সে বিয়ে করলেও ছেলেপুলে হতে হতে প্রায় সবাই বুড়িয়ে যায়। যায় না? নেহাৎ বুড়ো না হলেও পৌর তো হতেই হয়। হয় না?' সে বলে, 'খুঁজুন না, প্রায় বাড়িতেই আপনি এক আধটা ঐ পৌরপিতা পেয়ে যাবেন।'

'তোমার একটু ভুল হচ্ছে ভায়া।' বাধ্য হয়ে তখন আমায় বলতে হয়: 'এ পৌর সে প্রৌঢ় নয়। এই পৌর হোলো গিয়ে পুর থেকে—তোমার সেই নারকেলের পুর নয় কিন্তু—যে পুর মানে হচ্ছে শহর—সেই পুর শব্দ থেকেই এসেছে এই পৌর। পৌরপিতা মানে শহরের পিতা—পিতা, মানে কিনা, অভিভাবক।'

'পুর থেকে এসেছে পৌর? বলছেন আপনি?' দুই ভাইই বেশ বিস্মিত।

থেকে, শিশুরা এসেছে মায়ের পেট থেকে.....'

'থামো থামো! আর এগুতে হবে না। বোঝা গেছে।' ওকে থামাতে হয়। কেন না কিসের থেকে কে আসে, গোঁয়ার গোবর্ধনের তো তার কোনো জ্ঞানগম্যি নেই, মাঝ পথেই তাই ওকে নিরস্ত করি।

'তা, আমি প্রৌঢ় হয়েছি ঠিকই', হর্ষবর্ধন জানান, কিন্তু পিতা তো হতে পারিনি মশাই! আমি ঠিক প্রৌঢ় পিতা তো নই। কী করি বলুন তো এখন?'

'কিচ্ছু করবার নেই। বর্ষীয়সীর খপ্পরে যখন পড়েছেন ছাড়ান্ নেই আপনার। পাকড়ে যাবে ঠিক।'

'বড়শীঅসি না কী বললেন?' তিনি শুধান।



'বড়শীঅসি! যা বলেছেন।' গোবরা কিন্তু বুঝে নিয়েছেঃ 'হ্যাঁ, বড়শীঅসিই বটে! বড়শীর মতন টোপ ফেলে দাদাকে গেঁথেছে—কী বলব শিব্রামবাবু, আপনি ত্রিকালদর্শী—ঠিকই ধরেছেন আপনি মশাই! একবার যখন বড়শীতে গেঁথেছে, এবার অসি দিয়ে কেটে কুটে চাকলা চাকলা করবে, তারপর কড়ায় ফেলে হাড় ভাজা ভাজা করে ছেঁকে তোলে কিনা কে জানে! দাদার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে চিবিয়ে খাবে নির্ঘাত।'

'না না, ওসব কথা নয়। আমাকে গাঁথা টাঁথা কারো কম্ম না। তবে কিনা, এটা ইস্কুলের ব্যাপার তো। ইস্কুল পাঠশালাকে আমার ভারী ভয় মশাই! সেই ছেলেবেলার থেকেই।'

'কেন, ভয়টা কিসের?'

'ইস্কুলটার ঐ হেডমাস্টারনী, না কি লেডি প্রিন্সিপাল, কী বলল যেন, যদি আমায় তার ইস্কুলে ভর্তি করে নেয়? পড়াশোনায় আমার ভারী ভয় মশাই! এ বয়সে আবার কেঁচে গন্ডুষ করে বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো আমার সইবে না। পায়ে আমার বাত রয়েছে জানেন?'

'গেঁটে বাত নাকি?'

'মুখে আমার কোনো বাত নেই মশাই! বক্তৃতা টক্তৃতা করতে পারি না তা ঠিক, কিন্তু পায়ে বাত আছে দস্তুর মতন। বেশ বাত। বাতচিংই বলতে পারেন একরকম। চাগাড় দিলে তক্ষুনি বিছানায় গিয়ে চিং হয়ে পড়তে হয় আমায়।'

'তা হোক। তাহলেও আমার মনে হয়, ঐ বর্ষীয়সী মহিলার পাল্লায় পড়ে, মানে উনি যদি সত্যিই আপনাকে তাঁর ইস্কুলে ভর্তি করে নেন, সেটা আপনার পক্ষে ভালোই হবে। শাপে বর হবে আপনার।'

'রক্ষে করুন মশাই! অতো ভালোয় কাজ নেই আর.....! ইস্কুল পাঠশালার ত্রিসীমানায় আমি আর যেতে চাইনে!'

'কেন, আপনি কি ইস্কুল পাঠশালা মুখো হন্‌নি নাকি কখনো?'

'হব না কেন? হতে হয়েছিল। পড়েছিলাম দিনকতক গৌহাটির এক প্রাইমারি ইস্কুলে.....তবে বেশী দিন না। তাই থেকেই আমার এই অভিজ্ঞতা।'

'আহা, শেষ পর্যন্ত যদি পড়তেন, দু-একটা পাশ করে বেরুতেন যদি—তাহলে আজ আরো কতো বেশী উন্নতি করতে পারতেন আপনি।' ওঁর জন্য আমার দুঃখ হয়।

'হ্যাঁ, পাশ করতে পারলে ধাঙড়ের সর্দার হতে পারতাম আজ।'

'ধাঙড়ের সর্দার?'

'হ্যাঁ, তাই হতাম তো। বাবা তাঁর এক বন্ধুকে ধরে গোড়ায় আমায় গৌহাটির মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। লেখাপড়া কিচ্ছু শিখিনি, কেবল টিপসই করতে জানি, সেইজন্যে আর কী চাকরি হবে, ধাঙড়ের কাজ জুটেছিল একটা। তবে বন্ধুর ছেলে বলে মুন্সীপালী কর্তা আমাকে খুব নোঙরা কাজ করতে দেননি, ময়লা তুলতে হোতো না আমায়, ময়লা ফেলা তিন চাকার ঠেলা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে হত কেবল। তা, সে কাজ বেশ মজার-সে বয়সে ভালোই লাগত আমার। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ঐরকম ময়লা টানা বড় ঘোড়ার গাড়িটা কবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সেই ছিল আমার সুখস্বপ্ন। তবে সে স্বপ্ন আর আমার সফল হোলো না—বাগড়া দিলেন বাবা। তাঁর বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন যে, কোনো রকমে আপনার ছেলেকে অন্ততঃ প্রাইমারি পাশটা করিয়ে আনুন, ওকে আমি ধাঙড়ের সর্দার করে দেব। এখন আঙুলের টিপসই দিয়ে টাকা নেয় ও—একেবারে মুখ্যু! কাগজপত্রে নাম সই করতে শিখলে পর আর ধাঙড়দের রেজিস্টারি বইয়ের হিসেব রাখতে পারলেই হয়ে যাবে কাজটা।'

'তারপর?'

'তাই বাবা আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন তখন।'

'তা—শুনি তো আপনার পঠদ্দশার কাহিনী।' কৌতূহল হয় আমার।

'পাঁঠার দশা—কী বললেন? হ্যাঁ, তা পাঁঠার দশাই বটে মশাই! একদিন কামাই করলেই না, পাঠশালার স্যাঙাতরা এসে—পন্ডিতমশাই পাঠিয়ে দিতেন তাদের—আমাকে চ্যাংদোলা দোল্ করে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত ইস্কুলে—চ্যাংদোলায় দুলিয়ে।'

'চ্যাংদোলা?'

'চ্যাংদোলা কি রকম জানেন? চারটে ছেলে আমায় চিৎ করে ফেলে না, চার হাত পা ধরে আমায় ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যেত—মানা করলেও শুনত না, হাত পা ছুঁড়লেও নয়—এমন কি, আমি হেঁটে যেতে চাইলেও তারা রাজি হত না। অমনি করে নিয়ে যেতে ভারী মজা লাগত কিনা তাদের!'

'আর আপনার? আপনারও তো বেশ মজা লাগবার কথাই। অমনি করে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে ইস্কুলে যাওয়া!'

'যাস্‌সে তাই!' বলতে গিয়ে তাঁর মুখখানাও যাচ্ছেতাই রকম হয়ে ওঠেঃ 'ওই পাঁঠার দশা ভালো লাগে কারো? পাঁঠাদেরও লাগে না!'

'দাদাকে অমনি করে নিয়ে গেলে আমার কিন্তু মজা লাগত খুব।' এতদিন বাদেও গোবরা বেশ উৎসাহ বোধ করেঃ 'অমনি করেই তো আমারা পাঁঠাদের মাঠের থেকে ধরে নিয়ে আসতাম গোয়ালে। যে সব পাঁঠা চরতে গিয়ে সন্ধ্যের আগেই নিজের থেকে বাড়ি ফিরত না, মাঠে গিয়ে আমরা দুভাই না তাকে পাকড়ে অমনি করে চার পা ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে আসতাম বাড়িতে। কী চ্যাঁ-ভ্যাঁই যে করত তারা! কিন্তু তাদের কথা শুনছে কে!' গোবরার উল্লাস ধরে নাঃ! 'দাদাও অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে করতে ইস্কুলে যেত—বুঝলেন? তার পর সাত দিন আর স্কুল কামাই করত না দাদা।'

'ইস্কুলে পড়াশুনা হোতো কেমন?' আমি জানতে চাই।

'সে আর বলবার নয়। যদ্দূর হবার নয়।'

'মাস্টার পন্ডিতরা বেশ যত্ন নিয়ে পড়াতেন তো?'

'প্রাণপ্রণে যত্ন—অ্যাদ্দূর যে, এক মুখে বলা যায় না! একজন পন্ডিত যা পড়াতেন ভাবতেই এখন আমার হাসি পায়। না পড়ে টড়েও, খালি খবর কাগজ পড়েই, কিছু তো জ্ঞানগম্যি হয়েছে এখন আমার।'

হাসির কথাটা জানতে চাই আমি।

'পড়াবার সময় তিনি সমস্‌কৃত বাংলা ইংরেজি কিচ্ছু বাদ দিতেন না। একদিন কথায় কথায় একটা কথা বললেন—দাদুরী! আমরা বললাম, মানে কি স্যার দাদুরীর, বুঝতে পারলাম না তো। উনি বললেন, সমস্‌কৃত যে, বুঝবি কি করে? দাদুরী মানে হচ্ছে ভ্যাক্‌। আমি ভেবেছিলাম, দাদুর কোনো ব্যাপার ট্যাপার হবে হয়ত। যেমন আদুরি আদুরি আওয়াজ তাতে দিদিমা হওয়াও বিচিত্র না।—কিন্তু তা নয়, একেবারে ভ্যাক্‌! একটা ছেলে তাই শুনে খ্যাঁক করে উঠেছে, ভ্যাক্‌ কি পন্ডিতমশাই? পন্ডিতমশাই জবাব দিলেন, ভেক। কিসের ভেক?—আমি জানতে চাইলাম, যে ভেক না হলে ভিক্ষে মেলে না সেই ভেক নাকি? পন্ডিত বললেন, না রে না, বেং। বেং বুঝিস না? আমরা ঘাড় নাড়ি আবার। পন্ডিত এবার নাচারঃ আরে, বেং মানে হল গিয়ে ফ্রুগ। ফুরুগ। আমরাও তখন কাহিল, শুধাই, ফ্রুগ কী আবার! ফ্রুগ বলে তো বাপের কালে শুনিনি কখনো। পন্ডিতমশাই ক্ষেপে গেলেনঃ শুনবি কি করে? ইংরিজি কথা যে, শুনবি কি করে? আরো উঁচু কিলাসে ওঠ্‌, তখন শুনবি!'

'ফ্রুগ বুঝেছি।' আমি বললাম, 'উনি ফ্রগ বলতে চেয়েছিলেন। ফ্রগ মানে ব্যাঙ।'

'ভারী মজার পন্ডিত যে।' আমায় তা মানতে হয়।

'উনি মাঝে মাঝে আমার বাবার কাছে আসতেন—বাবাকে আমার পড়াশোনার খবর জানাতে। বাবা ওঁর জিম্মাতেই আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কিনা। উনি এলে বাবা বলতেন—পন্নাম হই দাদাঠাকুর! শুনে কোথায় উনি খুশী হবেন, না, ওঁর চোখ কপালে উঠে যেত। ভুরু কুঁচকে বলতেন, পন্নাম! র-ফলাটা খেললি কোথায়? প্রণাম হবে যে।'

'সেখানে পড়াশুনা কদ্দূর এগিয়েছিল আপনার?'

'ঐ ঘোড়ার পাতা অব্দি। ওয়ান মর্ন আই মেট এ লেম্‌ ম্যান.....ব্যস্‌, ঘোড়া দেখলাম কি আমি খোঁড়া হলাম। ঘোড়দৌড় আর আমার বিদ্যের দৌড় সমান।'

'তাহলে আর আপনার পাশ করা হয়নি শেষ পর্যন্ত?'

'নাঃ! ধাঙড় সর্দারের কাজ বরাতে থাকলে ত আমার। তবে ঐ পাঁঠার দশাতেই তলে তলে আমি কাঠের ব্যবসায় ভিড়ে গেছলাম। যার কর্ম তারে সাজে। আমার মতন আকাঠের ধাতে কাঠই পোষায়।' বলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে: শেষ পর্যন্ত ঐ কাঠই আমায় পুষতে লাগল।'

'ইস্কুলে থাকতে কি করে এলেন এই কাঠের কারবারে?'

'আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন, তিনি মাস্টারির সঙ্গে কাঠের কন্ট্রাক্টারি করতেন, আর ছাত্রদের সবার জমিজমার খবরাখবর নিতেন। আমাকে একদিন শুধাতে আমি বললাম, আমাদের জমিজমা বলে কিছু নেই, যাও বা আছে, সব জঙ্গলে ভর্তি। শুনে তিনি ভারী উৎসাহিত, বললেন—দেখিয়ো তো আমায় তোমাদের জঙ্গলটা। একদিন ইস্কুলের ছুটির পর দেখাতে নিয়ে গেলাম, দেখেই না উনি বললেন, খুব ভালো জঙ্গল তো। ভালো কাঠ আছে তোমাদের জঙ্গলে—দামী দামী কাঠের গাছ দেখছি সব। তোমার বাবাকে বলে কয়ে এই জঙ্গলটা আমায় ইজারা পাইয়ে দাও না। তোমার বাবাকে তো ইজারার টাকা দেবই, তাছাড়াও তোমাকে লাভের একটা বখরা আমি দেব। বাবাকে বলে, দিলাম জমিটা তাঁকে পাইয়ে। উনি সেই জঙ্গলের গাছ কেটে চালান দিতে লাগলেন শহরে, আর আমি রোজ ইস্কুলে যাবার নাম করে পড়া কামাই করে জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটার তদারকি করতে লাগলাম। বেশ মোটা টাকা পেয়েছিলাম প্রথম বছরেই। হাজার কয়েক তো হবে। তারপর আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে ঐ টাকা দিয়ে নিজেই ছোটখাট জঙ্গলের ইজারা নিতে লাগলাম, আরো মোটা লাভ হোলো। তারপর আরো ভারী ভারী জঙ্গল ..... এই করে করে ক্রমে ক্রমে ফলাও হয়ে উঠল আমার কারবার। লেখাপড়া আর হোলো না জন্মে। ভগবানের মার মশাই! যার বরাতে যেটা হবার তা হবেই। কেউ রুখতে পারবে না।'

'নির্ঘাত!' সায় দিল গোবরা।

'তা হয়ে ভালোই হয়েছে এক রকম। ভগবানের মার বটে, কিন্তু ভগবান নেহাত চামার নন দেখছি।' সায় দিই আমিও, 'তবে সেই সঙ্গে লেখাপড়াটা শিখলেও কিছু মন্দ ছিল না।'

'কী হোতো তাহলে?' ফোঁস করে ওঠেন দাদাঃ 'আপনার দশাই হোতো তো? ধারে কাটতে হোতো আমায়। এমন টাকার বোঝায় কাহিল হোতো হোতো না।'

'টাকা বলে টাকা! দাদার কতো টাকা জানেন? হিসেব করে থই পাওয়া যায় না। দশটা ব্যাঙ্কে থই থই করছে টাকা। আর লেখাপড়া শিখলে হোতো কি? না, আজ ধাঙড়ের সর্দার হয়ে কাল কাটাতে হোতো দাদাকে। আর আমি হতাম দাদার আন্ডারে এক ধাঙড়।' মুখ গোমড়া করে গোবর্ধন জানায়।

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী,' হর্ষবর্ধন বাতলান, 'কথায় বলে না? আমি ঐ সঙ্গে বলি আরো—ধাঙড়ে চ সরস্বতী।'

'কী বললেন কথাটা?' খট্ করে লাগে আমার। কথাটায় খটকা লাগে কেমন।

'মানে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী ধাঙড়ে চ সরস্বতী। শিক্ষিত লোকের কাজটা কি আর বলুন? ঐ ধাঙড়ের কাজই ত! লোকের মনের ময়লা দূর করা, অজ্ঞানের অন্ধকার, অশিক্ষার আবর্জনা এইসব সাফ করাই ত? আর এসব ত ধাঙড়েরই কাজ। তবে হ্যাঁ, উচ্চস্তরের ধাঙড় বলতে হবে।'

মানতে হয় কথাটা। মনে মনে মেনে নিয়েও মুখ ফুটে আমি বলি, 'এখন ত আপনার আর ধাঙড় হবার ভয় নেই। সে ফাঁড়া ত কেটে গেছে। এখন আর বিদ্যার্জনে বাধা কি, বলুন? তারপরে স্বয়ং মা সরস্বতী যখন দয়া করে বর্ষীয়সীরূপে দেখা দিয়েছেন.....'

'কেবল দেখা দেওয়াই নয়। নিজেও দেখেছেন বেশ নজর দিয়ে খুঁটিয়ে—আমি লক্ষ্য করলাম।' গোবরা যোগ করে।

'তাই নাকি? দাদার ওপর নেকনজর নাকি পড়েছে ওঁর— neck নজর, মানে, গলার ওপর কোপ মারবার মতলব নয় ত?'

'কি করে বলব! বড়শীঅসি বললেন না আপনি? আগে বড়শী দিয়ে দাদাকে বেশ করে গাঁথুক তো! তারপর না অসি দিয়ে কাটবার পালা! তবে গাঁথবে ঠিক নির্ঘাত!' গোবরা নড়ে চড়ে বসল।

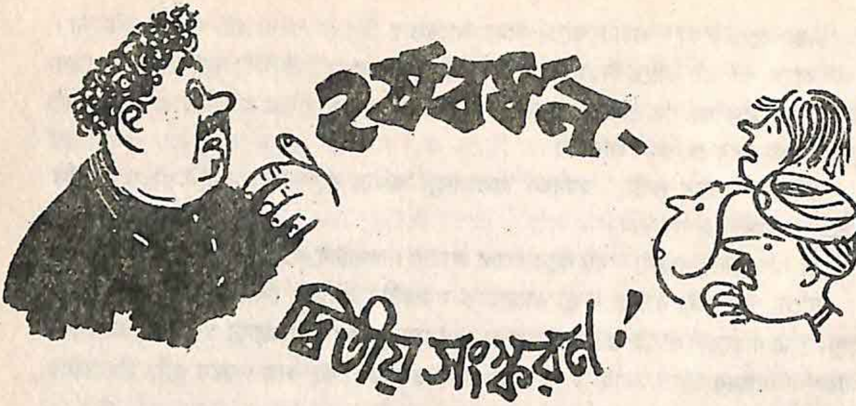
'বলিস নে গোবরা, বলিস নে! আমার বুক কাঁপছে।'

'ভয় কি দাদা! এবারও পাঁঠার দশাতেই তোমায় দোলায় করে নিয়ে যাবে, ভয় খেয়ো না।'

আমি চোখ তুলে তাকাই গোবরার দিকে। জিজ্ঞাসু চোখ।

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়েনঃ 'আমার আর নতুন করে পাঁঠার দশায় গিয়ে কাজ নেই, ভাই! তোর বৌদি নিজের পাঁঠা মনে করে আমার ল্যাজের আর একটুখানিও আস্ত রাখেননি, বাকী রাখেননি একটুও, হদ্দমুদ্দ কেটেছেন। কাটছেন এখনও। বাব্বা!





আমরা যাকে BEE জ্ঞান করি, আদি ও অকৃত্রিম সেই মৌমাছিরাই হচ্ছে মধুর আসল স্রষ্টা, খাঁটি মধু শুধু তাদেরই আমদানি, এই তো আমি জানতাম। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের অবদানেও যে মধু আবার মিলছে, সেদিন সেটা জানা গেল। জানলাম সেই ফেরিওয়ালার শ্রীমুখেই।

'মধু চাই! চাই খাঁটি মধু!!' পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল সে।

'ডাক্ তো মধুঅলাকে।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধনও। —'সকালবেলাটা একটু সুমধুর করা যাক আজ।'

গোবরা গিয়ে ডেকে আনল লোকটাকে।

'খাঁটি মধু বলে হেঁকে যাচ্ছ তো! দেখি তোমার কেমন খাঁটি মধু।' একটুখানি হাতে নিয়ে চেখে দেখলেন দাদা—'ওমা! এ আবার কী মধু গো! এমন টক টক তেতো তেতো কেন! মধু তো মিষ্টি হবে জানি।'

খেয়ে গোবরাও মুখ বেঁকে গেল—'কেমন যেন গেঁজে গেছে মধুটা! তাই না দাদা?'

উপস্থিত আমিও ও রসে বঞ্চিত রইলাম না। 'হ্যাঁ, যা বলেছো ভাই! মধু নয়, মধুর গন্ধ নাই।' বলতে হোলো আমাকেও।

'এ কোথাকার মধু হে?' জানতে চান হর্ষবর্ধন।

'কেন, আমাদের এই বেলেঘাটার মধু। আমাদের নিজেদের কারখানার বানানো।' জানালো সেঃ 'খাঁটি বৈজ্ঞানিক মধু বাবু!'

'বৈজ্ঞানিক মধু! সে আবার কি হে! মধু কি কারখানায় বানানো যায় নাকি? মধু তো যদ্দূর জানি মৌমাছির কাণ্ড। তবে হ্যাঁ, ওদের মৌচাক-কে যদি কারখানা বলো তো......'

'এক কথায়, মৌমাছিদের কাণ্ড-কারখানাও বলা যায় বোধ হয়।' সায় দেয় গোবরা।

'কারখানায় মধু বানাতে পারে না, কী যে বলেন বাবু! কত কী বানায় কারখানা—খাঁটি ঘি থেকে খাঁটি সর্ষের তেল পর্যন্ত......আজকাল বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কিছু আছে নাকি! অসম্ভব সব কাণ্ড করছে তারা।' জানালো সেই বিজ্ঞানের ফেরিওয়ালা।

'কি রকম কি রকম?' হর্ষবর্ধন কৌতূহলী হন।

'বনস্পতির সঙ্গে ঘিয়ের রঙে মিলিয়ে খানিক গব্যের সেন্ট মিশিয়ে দিলো, হয়ে গেল

খাঁটি গাওয়া ঘি—আঠারো টাকা কেজি! আটানার মালমশলা দাঁড়িয়ে গেল নেট আঠারো টাকায়। শেয়াল কাঁটা বীজের নির্যাসের সঙ্গে সর্ষের তেলের সেন্ট মেশালেই হোলো গে খাঁটি সর্ষপ তৈল—মাছ ভেজে খান—গায় মেখে নিন—নাকে লাগিয়ে ঘুম দিন—কি কারো পায়ে মাখিয়ে কোনো কাজ হাসিল করুন। চমৎকার লাগসই। এমনি আরো কতো জিনিস—কী আর বলব! কী চাই, বলুন না? এনে দিচ্ছি এক্ষুণি আমাদের কারখানার থেকে।'

'একশ টাকার নোট?' আমি জানতে চাই। আনতে ঠিক না চাইলেও।

'হ্যাঁ, তাও আনিয়ে দিতে পারি কারখানার থেকে বানিয়ে—উপযুক্ত মেহনতি পেলে। কখানা চাই আপনার? কিন্তু সে নোট বাজারে চালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়েন বাবু, জেল হয়ে যায় আপনার, তো তার জন্য কিন্তুক দায়ী নই আমরা। আমাদের কারখানার বানানো, সেকথাও আপনি ফাঁস করতে পারবেন না কোথাও।'

'আর এই মধু?'

'এও আসল খাঁটি জিনিস। আদত চিনির রসকে ঠিক মতন পাক দিয়ে মধুর সেন্ট মিশিয়ে তৈরী হয়েছে........'

'বুঝেছি, তোমাদের জাল আর ভ্যাজালের বৈজ্ঞানিক কারখানা। এসব জিনিসে আমাদের দরকার নেই। আমরা খাঁটি মধু খেতে চাই।' বললেন হর্ষবর্ধন।

'খাঁটি মধু কি কেউ খেতে পায় নাকি মশাই! হাসালেন আপনারা।' হাসল ফেরিওয়ালা। ফেরিওয়ালার কথায় গোবর্ধনও হাসল, বলল, 'কেন, মৌমাছিরা? তারাও খেতে পায় না?'

'হায় কপাল! মৌমাছিরা খাবে মধু! সেই কপাল তারা করেছে? ফেরিওয়ালা নিজেকেই মৌমাছি ভ্রম করল কিনা কে জানে, নিজের কপালে হাত দিয়ে বলল কথাটা। তাদের খালি মধু বয়ে মরাই সার। শুধু মৌচাকে মধু জমায় আর তাদের সেই চাক ভেঙে ফাঁক করে দেয় অন্য লোক.....'

'সেই অন্য লোকরা তো খেতে পায় তাহলে?'

'কখনো-সখনো।' বলে সে, 'খাঁটি মধু কেউ খেতে পায় না বাবু। খাঁটি মধু বাঘে খায়।'

'বাঘে খায়!' অবাক হলাম আমরা তার কথায়ঃ বনের ভেতর বাঘ তুমি পাচ্ছো কোথায়?'

'কেন সুন্দরবনের। সেখানেই তো যতো বাঘ। বনের মধুও পাবেন সেই অঞ্চলেই। চাকভাঙ্গা মধু।'

'তার মানে?'

'তার মানে, মৌমাছিরা তো গাছের ডালেই মৌচাক বাধে। এত গাছ আর কোথায়—সুন্দরবনের জঙ্গল ছাড়া, বলুন! আর রাজ্যের মধুয়ালরা সেখানেই মৌচাক কাটতে যায়। খাঁটি মধু পাবেন তাদের কাছেই। খাঁটি মধু খেতে হলে সেখানেই যেতে হবে।'

'তবে তুমি যে বললে খাঁটি মধু খালি বাঘেই খায়? বনের মানে তো বুঝলাম না ভাই!'

'তার মানে পাবেন সেইখানেই। তার জন্যেও যেতে হবে সেই সুন্দরবন।'

মধুর ফেরিওয়ালা চলে যাবার পর হর্ষবর্ধন চাঙ্গা হলেন আবার—'বেশ যাব। যাব

সেই সুন্দরবনেই। খাঁটি মধু খেতেই হবে আমায়। না খেয়ে স্বস্তি নেই।'

'চাপল বাই তো কটক যাই!' মুখে ব্যাজার করলেন হর্ষবর্ধনের বৌঃ 'বাঘের পেটে না গিয়ে বুঝি স্বস্তি হচ্ছে না তোমার?'

'আমি কি মধু যে বাঘ আমায় গিলতে যাবে?' হর্ষবর্ধন জবাব দেনঃ সুন্দরবনের বাঘরা খাঁটি মধুই খায় খালি। শুনলে না? তাছাড়া, আমরা কি বনবাসে যাচ্ছি নাকি? আমরা তো থাকব, বন থেকে দূরে, বনের আশেপাশে—ধারে কাছের কোনো এক ডাকবাংলোয়, মধুয়ালারা মৌচাক কেটে ভাঁড় ভর্তি করে মধু নিয়ে শহরতলীর বাজারে বেচতে আসবে আর আমরা তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আমাদের জারে ভরব.....'

'পেটে ভরব না?' গোবরা শুধায়।

'সে আর বলতে! পেটে যা ধরে তারপরে তো জারে। জারে জারে। জারের পর জারে। হাজারে হাজারে। মানে, যতগুলি জার পাওয়া যাবে সেখানকার বাজারে। তুইও তো যাবি। তুইও খাবি।'

'কিন্তু বাঘ.... বাঘে যদি.... ' গোবরা আমতা আমতা করে বলে—'বাঘে যদি আমায় বাগে পায়?'

'বাঘ তোর দিকে ভুলেও তাকাবে না। আমি রয়েছি না তোর সঙ্গে?' সাহস দেন দাদা—'আমাকে দেখলে...মানে রাজভোগ দেখতে পেলে কেউ কি আর মিহিদানার দিকে নজর দেয়? আপনিও চলুন না শিব্রাম্‌বাবু সুন্দরবন? খাঁটি মধু খাবেন এখন।'

'কোন্ দুঃখে?' আমি বলিঃ 'আমার এত সুন্দর সুন্দর বোন থাকতে মধু খেতে আমায় সুন্দরবন যেতে হবে কেন? বোনেরা যা আমাকে খেতে দেয় তাই আমার কাছে মধুর। মধুর থেকে কিছু কম মিষ্টি নয়।'

'তাহলেও আপনি সঙ্গে যান।' হর্ষবর্ধনের স্ত্রী অনুরোধ করেন আমায়ঃ 'আপনি সঙ্গে থাকলে আমি খুব ভরসা পাব। আপনার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তো—আপনি ওঁর চৌকি দিতে পারবেন।'

যে-সার্টিফিকেট আমায় কেউ দেয় না সেই বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসায় আমার মন গললেও বাইরে টলি না। বলি, 'আমায় কেন দিতে হবে চৌকি? তার জন্যে চৌকিদারই ত রয়েছে। কোম্পানির মুল্লুকে কোথায় নেই চৌকিদার? রাতদিন চৌকি দেয়াই তাদের কাজ। তারাই চৌকি দেবে।'

'তাহলেও আপনি যান। আপনি গেলে আমি মনে স্বস্তি পাই।' উপরোধ করেন উনি তারপরও।

'আসল কথা কি জানেন?' আমি ব্যক্ত করিঃ আমি হচ্ছি দারুণ কলকাতাসক্ত লোক—কলকাতা থেকে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে শক্ত ব্যাপার। আমার নিজের আস্তাবল ছেড়ে আর কোথাও অন্য কোনো আস্তানায় যাবার আমার বাসনা হয় না। মধু খেতে সুন্দরবন যাওয়া দূরে থাক অমৃতস্বাদ নিতে স্বর্গে যেতেও আমার সাধ হয় না। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো অর্থ পাই না আমি।'

'পান না অর্থ? এই নিন অর্থ।' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষেপে গেলেন, 'এই নিন এক হাজার, এই নিন আরেক হাজার, এই নিন আরো এক হাজার, এই আবার আবার আরেক.....'

পাঁচ হাজার টাকার পাঁচখানা নোটের বাণ্ডিল তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন—'এবার তো পেলেন অর্থ? আর তো কলকাতা ছাড়ার কোনো বাধা রইল না?'

বলাই বাহুল্য! টাকা পেলে লোকে জাহান্নামে যেতে পারে। বাঘের মুখে যাওয়া আর এমন কী! আমিও রাজি তৎক্ষণাৎ।

হর্ষবর্ধনের গিন্নী বললেন গোবরাকে—'ঠাকুরপো, তুমি তাহলে শ পাঁচেক টাকা এক্ষুণি টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার করে দাও সুন্দরবনের চৌকিদারকে—দিন পাঁচেকের জন্য তাকে চৌকি দিতে হবে—দিন রাতের চৌকি। কবে যাচ্ছো সেটাও জানিয়ে দাও তার করে। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম হবে না।'

যথাদিবসে যথাস্থানে পৌঁছে দেখি আমাদের সসম্মানে অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং চৌকিদার দাঁড়িয়ে। ঠিক জানি না, তবে চৌকিদারই হবেন বোধ হয়।

'এই যে আপানারা এসে গেছেন বাবুরা! আপনাদের চৌকিও মজুদ—সেও এসে গেল বলে।'

'ও! এসে গেলেন! তা, চৌকিদারবাবু আসছেন কখন?' গোবর্ধন শুধালেন।

'চৌকিদার তো আমিই বাবু!' সে বললে—'আমি আপনাদের চৌকির কথা বলছিলাম। পাঁচ জনের মত চৌকি চেয়েছেন না আপনারা? তাই সেটা ফরমাস দিয়ে বানাতে হলো।'

'পাঁচজনের জন্য নয়, পাঁচ দিনের জন্য চৌকি দিতে হবে আপনাকে।' আমি চৌকিদারের



ভুল শোধরাই।

'পাঁচদিনের কথা কী বলছেন! সুন্দরবনের সুঁদরি কাঠের চৌকি। সুন্দরবনের নাম এই সুঁদরি কাঠের জন্যেস জানেন ত? এমন টেকসই কাঠ আর হয় না বাবু—আপনাদের ফ্যাশানী টীক কাঠ কোথায় লাগে ভারী মজবুত বাবু। পাঁচ দিন কী বলছেন পাঁচ পুরুষে জন্য আপনারা নিশ্চিন্দ।'

দেখতে দেখতে চার জন মানুষের কাঁধে চেপে পেল্লায় এক চৌকি ,সে হাজির।

'বাজিয়ে দেখুন না বাবু কেমন টেকসই। বসে দেখুন, শুয়ে দেখুন, এর ওপর লাফিয়ে দেখুন—কি রকম মজবুত!'

'তুমি বলছো পাঁচ পুরুষের জন্য নিশ্চিন্তি!-হর্ষবর্ধন বললেন,—'কিন্তু আমাদের এই আড়াই পুরুষ আঁটলে হয়। আমরা হৃষ্টপুষ্ট দুজন—' আমাদের দেখিয়ে তারপর গোবরার দিকে তাকিয়ে তিনি ভ্রূভঙ্গ করলেন—'আর আমার ভাইকে যদি অর্ধপুরুষ ধরি ও এখনো নাবালক তো।'

'আমি অর্ধপুরুষ? আমি নাবালক?' ফোঁস করে ওঠে গোবরা—'কী আলতু ফালতু বাজে বকছো দাদা।

'নাবালক নাই হলি, আমি একাই তোদের তিন পুরুষের ধাক্কা—সেটা দেখেছিস? আমি ঐ চৌকিতে শুয়ে যদি বা একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুই, তুই আমাকে নিশ্চিন্তি হতে দিবি কি? ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে কখন আমার চাপে চ্যাপটা হয়ে যাস সেই ভয়েই তো আমার ঘুম হবে না। না বাপু চৌকিদার, তুমি আগে দুখানা চৌকি দ্যাখো। আমি একটু নিশিন্তি হয়ে ঘুমোতে চাই। সেগুলো এক এক পুরুষের মত হলেও ক্ষতি নেই।'

চৌকিদার তখন তার লোকদের আরো দুখানা আনবার জন্য হুকুম করল। তারপর বলল—

'এই চৌকিটার দরুণ বিশ টাকা—আর দুখানা ছোট খাট হবে তো, তাদের দাম দশ টাকা করেই ধরুন—এই গেল চল্লিশ টাকা—বাকী থাকে চার শো ষাট ধরুন এই আপনার চার শো ষাট।' ট্যাঁক থেকে সে এক গোছা টাকা বার করে বসে—'চৌকির জন্য এত টাকা পাঠিয়েছেন কেন বাবুরা? এত লাগে না তো। সুঁদরি কাঠের চৌকি হলেও লাগে না।'

'আহা, এই চৌকি দেবার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে নাকি টাকা? তোমাকে আসল চৌকি দিতে হবে যে। তুমি চৌকিদার না? পাহারা দেবে আমার দাদাকে, দিন রাত পাহারা—চার পাঁচ দিন থাকব আমরা এই কদিন কেবল—আর সেই জন্যেই বৌদি তোমাকে টি-এম-ও করে ওটা পাঠিয়েছে। ও টাকা তুমি রাখো।

'কিসের পাহারা?' চৌকিদার একটু অবাক হয়।

'বাঘের হাত থেকে বাঁচাবে আমার দাদাকে — সেই সঙ্গে একটু একটু আমাদেরও। সুন্দরবনে বাঘের ভয় নেই?'

'তা তো আছে বাবু, রীতিমতই আছে—কিন্তু বাঘের হাত থেকে কি কেউ বাঁচাতে পারে? কথায় বলে, সাপের লেখা বাঘের দেখা। বাঘ দেখলো কি নিলো। এক লাফে সোজা ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, পরের লাফে লোকটাকে মুখে করে নিয়ে পালাবে চোঁচা। কেউ বাঁচাতে পারবে না—চৌকিদার দূরে থাক, কোনো দারোগার বাপের সাধ্যি নেই যে বাঁচায়! জজ ম্যাজিস্টর নয়। বাঘকে তো অ্যারেস্টো করা যায় না বাবু, দায়রাসোপর্দ চলে না।'

'সে কি গো।' শুনে আমি আঁতকে উঠিঃ 'তবে যে শুনলাম এখানকার বাঘ মধুই খায় খালি। মধু খেয়েই বেঁচে থাকে নাকি।'

'তা, আপনারা শিকার করতে এসেছেন ত?' আমার কথায় জবাব দেয়া বাহুল্য বোধ করে সে শুধায়, 'বাঘ শিকার করতেই তো আসেন এখানে ভদ্দর লোকরা। তা আপনারা

তো বাঘ শিকারেই...... ?'

আমরা অস্বীকার করায় সে বললে, 'শিকার করবেন না তো কি কারণে এসেছেন এই সোঁদরবনে? চৌকির জন্যে নয় নিশ্চয়?'

'আমরা মধু খেতে এসেছি।' ঢোঁক গিললেন দাদা।

'তা, মধুর জন্যে জঙ্গলের ভিতরি আপনাদের সিঁধোতে হবে না। এখান দিয়ে, এই সামনের পথ ধরে মধুর হাঁড়ি ঘাড়ে করে মধুয়ালরা যাবেন সব, এই বাংলোয় বসেই কিনে কিনে খেতে পাবেন। এত দূরে এখানে বাঘের কোনো ডর নেই। বাঘ অ্যাদ্দুর বড় একটা আসে না। আপনারা এখানে বসেই খাঁটি মধু পাবেন—যত খুশি।'

'তা না হয় হোলো। কিন্তু খাঁটি মধু খায় বাঘে বলে একটা কথা শুনেছি যে—তার মনেটা কি, আমরা জানতে চাই।'

'মানে আজ সকালেই একটা দেখা গেছে বাবু! হাঁড়ি ভর্তি মধু নিয়ে মধুয়ালাটা জঙ্গলের পথ ধরে আসছিল, এমন সময় সামনে দ্যাখে এক বাঘ—বাঘটাও তাকে দেখছিল। আর যাবে কোথায়? সাপের লেখা বাঘের দেখা—কথায় বলে না? মধুয়াল ভাবল, আর বাঁচন নেই, মারা যেতেই হবে—তবে মধুটা কেন মারা যায়? চিরকাল মধু বয়েই মরি, খাবার সুযোগ হয়ে ওঠে না— মধু চাখতে পাই না কখনো। মারা যাবার আগে মধুটা



সাবাড় করে ফেলা যাক। বলে বেবাক মধুর হাঁড়িটা সে চোঁ চোঁ করে ফাক করে দিয়েছে.......'।

'তারপর?' আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস।

'তারপর সেও মধুটা শেষ করছে আর বাঘটাও এসে তাকে খতম করছে। মধু গেল তার পেটে সে গেল বাঘের পেটে—খাঁটি মধুর সবটাই বাঘের পেটে গেল তো? পেটে পেটেই পাচার হয়ে গেল সব।'

'তা বটে।' হাঁফ ছাড়লাম আমরা।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁফ ছাড়তে পারা গেল না। চৌকিদারের সঙ্গে গোবরা মাছ ধরতে গেছল নদীর ধারে। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল সে।

'কাঁদছ কেন ভাই?' আমি শুধাই। তারপর তার শূন্য হাতের দিকে তাকিয়ে—'মাছ পাওনি তাই? তাতে কী হয়েছে? মাছ ছাড়া কি চলে না একদিন?'

'কাঁদ্‌ছিস ক্যান র‍্যা? কী হয়েছে? বাঘে তোকে ধরে খায়নি ত? আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে নাকি? খাবলে খুবলে নিয়েছে হাত পা? আয় দেখি।' দাদা ওর আগাপাশতলা টিপে টিপে দ্যাখেন—'আস্তই তো আছিস। বাঘের পেটে যাস নি তো? তবে কাঁদছিস কেন?'

'বাঘের পেটে গেলে কি আর কাঁদবার ফুরসৎ পেত বাবু!' বলল চৌকিদার।

'তাহলে?' আমি জিগ্যেস করিঃ 'তাহলে হয়েছেটা কী?'

'যা হবার হয়ে গেছে।' বলল সেঃ 'দাদা আর বেঁচে নেই মশাই!'

'অ্যাঁ? সে কি রে? অ্যাঁ?' অ্যাঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন : 'বেঁচে নেই বলিস কি?'

'হ্যাঁ। দেখে এলাম নদীর ধারে। দাদার লাশ পড়ে আছে সেখানে। আমি আর চৌকিদারবাবু দুজনেই দেখলাম তো।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল চৌকিদার : 'যথার্থ বাবু!'

'দাদার লাশ!' আমি দাদার দিকে তাকালাম, হ্যাঁ, দাদা একখান লাশ বটেন! কিন্তু দাদা এমন জলজ্যান্ত খাড়া থাকতে দাদার লাশ হয় কি করে? এ লাশ তো সে লাশ.......মানে, সে লাশ তো এ লাশ নয়।

'বিশ্বাস হয় না।' আমি বললাম।—'সেটা তোমার দাদার বিলাস হতে পারে।'

'দেখে এলাম নিজের চক্ষে। আমরা দুজনে স্বচক্ষে দেখলাম। বাঘে মেরে ফেলে রেখে গেছে দাদাকে। পরে রাত্তির হলে এসে নিয়ে যাবে লাশটাকে, লোকগুলো বলল। নিয়ে গিয়ে খাবে।'

'বাঘে খাবে আমায়?' হর্ষবর্ধনের কাঁপুনি দেখা দেয়ঃ 'আমাকে মানে, আমার সেই লাশটাকে নিয়ে গিয়ে খাবে রাত্তিরে। তুই বলছিস?'

'আমি কী বলছি! আমি কেন বলব! আমি কি বাঘের চালচলন জানি, না, তাদের মতিগতির খবর রাখি? যারা দাদার লাশটার চারপাশে জড়ো হয়েছিল তারাই সব বলাবলি করছিল।'

'বার বার তুই আমায় লাশ লাশ বলবি না, বলে দিচ্ছি।' 'খাপ্পা হয়ে ওঠেন দাদা—'সাবধান করে দিচ্ছি তোকে। অ্যা—এমন কি মোটা আমি যে লাশ হয়ে গেছি—আঁ?

'রাগছেন কেন কর্তা!' চৌকিদার মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিতে যায়ঃ 'মারা গেলে সবাই লাশ—তা মোটাই কি আর শুঁট্‌কোই কি! আমি লাশ আপনিও লাশ।'

'তুমি ঠিক ঠিক দেখেছো তো হে যে তোমার দাদাই সেটা ঠিক? চোখের কোনো ভ্রম হয়নি ত?'

'এই ভর দুপুর ভ্রম? আপনি বলছেন কি মশাই? অবিকল আমার দাদা। আমার দাদাকে আমি দেখিনি নাকি? জন্ম থেকে দেখে আসছি— রাতদিন দেখছি আমার দাদাকে।

সেই নাক, সেই মুখ সেই ভুরু—সেই চোখ—চোখটা অবশ্যি এখন একটু বোজা আর নাকটা আধখানা খাবলানো—তাহলেও আমার দাদাই ঠিকঠিক।'

'আমার মতন এই রকম লম্বা চৌড়া?' হর্ষবর্ধন অনুসন্ধিৎসু হন: 'এই সন্ থাব্‌বল থাঁইয়া?'

'অবিকল। এই রকম—কী বললে না? থাব্‌বল্ থাঁইয়া? রাস্ট্র ভাষায় কী যেন বললে, কে জানে! তা এই রকম থলথলে চেহারাই বটে।'

'গোদা গোদা হাত পা?' আমি জানতে চাই: 'ঘাড়ে গর্দানে?'

'হুবহুব্।' সে জানায়: 'এমনকি, একই রকমে কোট গায়। মোজা পায়। একই ধরনের জুতো।'

'কোটের গলার বোতাম সব আটকানো?' দাদা জানতে চান: 'এই রকমটা?'

'হ্যাঁ, ওই রকম। পরণে ওই রকম আটপৌড়ে খাটো আট হাত ধুতি।'

'তাহলে তুই ঠিকই দেখেছিস।' বলে হর্ষবর্ধন কাঁদতে বসেন—'যা তোর বৌদিকে তার করে জানিয়ে দে তাহলে যে সে আজ সকালে বিধবা হয়েছে। মাছ টাছ আর যেন না খায়। শাড়ি ছেড়ে থান ধুতি পরে। পরে ঠিক দিন দেখে মাথা মুড়িয়ে ছেরাদ্দটা যেন করে আমার।' তিনি কাঁদতে থাকেন: 'আর, বছর খানেক বাদে যেন গয়ায় গিয়ে আমার পিণ্ডিটা দিয়ে আসে। এই লাশজন্ম থেকে সেই কৈলাস গিয়ে যেন দেবাদিদেব মহাদেবের ছিচরণে ঠাঁই পাই বাবার পাদপদ্মে।'

কাঁদতে কাঁদতে যেন কী মনে পড়ে, হঠাৎ টনক নড়ে তাঁর—'আচ্ছা, গোঁফ ছিল সেই লোকটার? এস রকমের পুরুষ্টু গোঁফ? দেখেছিস?'

'দেখেছি কি?' গোবরা চৌকিদারের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়: 'মনে পড়ছে না ত? গোঁফ ত দেখিনি মনে হচ্ছে।'

'না—গোঁফ ছিল না লোকটার।' চৌকিদার জানায়: 'এ ধরনের গোঁফ ত নয়ই. এরকম গোঁফ এ মল্লুকেই কারো নেই। আমি দেখেছি ভাল করে তাকিয়ে।'

'তবে সে আমি নই।' কান্না থামিয়ে লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন: 'তাহলে সে অন্য আর কেউ হবে!

হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি শুনি আমরা এতক্ষণের পর।





হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই! বাঘ মারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়চি না।'

'কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে? পুষবে নাকি?'

'মারব ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব তুই ভেবেছিস?'

'তোমাকে আর মারল কোথায়? মারতে পারল কই?'

'একটুর জন্যেই বেঁচে গেছি না? মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায়?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে কথার কোনো জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কি!' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু চুমরে নিলেন— 'এই গোঁফের জন্যেই বেঁচে গেছি আজ! নইলে ওই লোকটার মতই হাল হত আমার.......'

মৃতদেহটির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—'গোঁফ বাদ দিয়ে, বেগোঁফের বকলমে ও তো খোদ আমিই। আমার মতই হুবহু। ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম। কী হত তাহলে বল্ ত?'

গোবরা সে-কথারও কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

'এই চৌকিদার!' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পারো আমায়? যত টাকা লাগে দেব।'

'বন্দুক নিয়ে কী করবে বাবু?'

'বাঘ শিকার করব, আবার কি? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ?' বলে আমার প্রতি ফিরলেন: 'আমার এই বীরত্ব-কাহিনীটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমি শুনেছি।'

'তার কী হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার কাহিনী। এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্যে বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন? বনে বাদাড়েই বা যেতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কী মানে আছে? বন্দুকের কোনো দরকার নেই। সাপ ব্যাঙ একটা হলেই হোলো। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুশেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপ্পনি কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু!' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—'তা, টাকা দিলে এনে দিতে পারি একটা বন্দুক—দুদিনের জন্য। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর আবার ফেরৎ দিয়ে আসব।'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কী করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি কার্তুজ টোটা ইত্যাদি এসবও তিনি দেবেন ত? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে।'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ টার্তুজ দেবেন বইকি বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোরো না। বাঘ না মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে। জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই।' আমি বাতলাই: 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায়? আর কিছু না হোক, একটু গাঁজা খেতে হবে অন্ততঃ।'

'আনব নাকি গাঁজা?' সে শুধায়।

'গাঁজা হলে ত বন্দুকেরও দরকার হয় না। বনে বাদাড়েও ঘুরে মরতে হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবারও কোনো প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না গাঁজা ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখম বিস্কুট চকোলেট—এই সব এনো পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এলে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগেই পাওয়া যায় না ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায়।'

'বনের ভিতরি সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

গভীর বনের ভেতর পা বাড়াতেই প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোনো বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না—আস্ত একটা কোলা ব্যাঙ।

ব্যাঙ দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাঙ ভারী পয়া, জানিস গোবরা?'

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি?'

'সে তো প্যাঁচা। দাদা জানান—'কে না জানে!'

'যা বলেছেন।' আমি ওঁর কথায় সায় দিই—'যতো প্যাঁচালো লোকই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর

বাহন। প্যাঁচ কসে টাকা উপায় করতে হয়, জানো না ভাই?'

'তাহলে ব্যাঙ বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের.....না, না ......' বলে গোবরা নিজেই শুধরে নেয়—'সে তো হোলো গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?'

'মনে আছে। পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে।



তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে.....'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মনি ব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তার পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কি, ওমা, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়া ব্যাঙ একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তার পর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর।'

'ব্যাঙ তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাৎ।' গোবরা ধারণা করে; 'যতো কারবার আর কারখানার কর্তা ঐ ঠাকুরটি তো। কী বলেন মশাই আপনি? ব্যাঙ বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে?'

ব্যাঙ না হলেও ব্যাঙ্ক ত বটেই। বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ঐ ব্যাঙ্ক। আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধহয় ওই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক।'

'ব্যাং থেকেই ব্যাংক। একই কথা।' হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হত।—'ব্যাঙ থেকেও আমার আমদানি, আবার ব্যাঙ্ক থেকেও।'

'ব্যাঙটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়লো।' আমি বলি—'জাম্পিং ফ্রগের গল্প। মার্কটোয়েনের লেখা। ছোটবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্কটোয়েন মানে? হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জাম্পিং ফ্রগ?' গোবরার জিজ্ঞাস্য।

'জাম্পিং মানে লাফানো, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। মানে যে ব্যাঙ কিনা লাফায়।'

'লাফিং ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই।'

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্কটোয়েনের সময়ে সেখানে, ঘোড় দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙে দৌড় হত। লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাঙ, যার ব্যাঙ আর সব ব্যাঙকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কি, অন্য সব ব্যাঙকে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হুল্লে—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুঁচি খাইয়ে বেশ ভারী করে দিত কেউ কেউ।

'খেত ব্যাঙ সেই পাথর কুঁচি?'

'অবোধ বালক ত! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে: 'এই ত পাওয়া গেছে একটা ব্যাঙ—এখন বাজিয়ে দেখা যাক না—খায় কি না।'

গোবরা কতকগুলো পাথর কুঁচি যোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাঙটাকে। হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুঁচি ধরে দিতেই, কী আশ্চর্য, তক্ষুণি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট। তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাঙটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফানো দূরে থাক, নড়া চড়ার কোনো শক্তি রইল না তার আর।

'খেলত বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলে: 'ভাতের সঙ্গে এতদিনে যত কাঁকর গিলেছি, ছোটখাট একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্ভে। হয়নি হজম?'

'আলবাৎ হয়েছে।' আমি বলি: 'হজম না হলে তো যম এসে জমত।'

'ওই দ্যাখো দাদা!' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি। প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়ত, এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাঙটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাই বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাঙটাকে এসে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাঙটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল। তারপর গিলতে লাগল আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ-লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্টু ব্যাঙটা তার তলার দিকে চলতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেকে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাঙটা তার পিঠের উপর কুঁজের মত উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাঙটাকে গিলে সাপটা উট হয়ে গেল যেন শেষটায়। তার মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। খুব তীব্র বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয়ত দেখা যায়। ভ্যাবাচাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জবুথবু নট নড়ন চড়ন সে পড়ে রইল সেইখানেই।

তারপর তার আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার। বুঝলে দাদা? সাপের পেটে ব্যাঙ, আর ব্যাঙের পেটে যতো পাথর কুঁচি। আগে ব্যাঙ পাথর কুঁচিগুলো হজম করবে তারপরে সে হজম করবে গিয়ে ব্যাঙটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।'

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক।' আমি তখন বলি 'ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখনরুটি ইত্যাদি খবর কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম আমরা। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মত তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময়ে জঙ্গলের ওধারে একটা খসখসানি আওয়াজ পাওয়া গেল। 'বাঘ এসে গেছে বাবু!' চৌকিদার বলে উঠল, শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই। ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কি করে যাবে। আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব—ওর জন্যে রেখেছি নাকি?' বলল গোবরা—পাঁউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথর কুঁচিগুলো সাপের পেটে গেলে ঠিক সেই ভাবে।' আমি বিশদ করি

'একগুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন— 'ওমা! এটা যে সাপটা।' বলেই তিনি আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু।' বলল চৌকিদার : 'আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে আছে।'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জানো?'

'না বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুঁদার ঘায় ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকে তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে পড়েছে গিয়ে তার উপর।

কিন্তু তার আগেই না, কয়েক চক্করের পাক খেয়ে , সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাঙটা আর ব্যাঙের গর্ভ থেকে যতো পাথর কুঁচি তীর বেগে বেরিয়ে—ছর্‌রার মতই বেরিয়ে—লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়—তার চোখে মুখে নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়া চড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা ? ' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগুলাম।



চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদায় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। দিয়ে বলল—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু তাই বন্দুকটাও মারলাম তার ওপর।'

'এবার কী করা যাবে ? ' আমি শুধাই : 'কোনো ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখানা।'

'এখানে ফোটো-ওলা কোথায় বাবু এই জঙ্গলে ? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে একচোটে দফাদারও হয়ে যাব আমি—এই বাঘ মারার দরুন। বুঝলেন ? '

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদার।' গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ শিকার করলেন আপনি দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

হর্ষবর্ধনের অশ্বরোগ

'এমন হন্যে হয়ে কোথায় ছুটেচ গোবরা ভায়া? কিসের জন্যে?'

শ্রীমান গোবর্ধন চন্দরকে হন্তদন্ত দেখে দাঁড় করিয়ে আমি তদন্ত করি।

'রাম ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।' সে সংক্ষেপ জানায়। আর, খবরটা দিয়েই না পরের ক্ষেপে পা বাড়ায়।

'কেন, ডাক্তারের কাছে কেন হে? কার ব্যারাম হোলো আবার?'

'দাদার। ঘোড়ারোগে ধরেছে দাদাকে।'

'ঘোড়ারোগে? ও, বুঝেছি, আজ শনিবার যে!' বলে আমি সমঝদারের ন্যায় ঘাড় নাড়ি—'কিন্তু এই মাঠের রোগ কি সারাতে পারবে ডাক্তার? ডাক্তার কি করবে তার?'

'মাঠের রোগ?'

'রোগও বলতে পারো, রোখও বলা যায়। তবে এ রোগ যার চাপে তাকে আর রোখা যায় না ভাই—সারানো দূরে থাক। এক একটা যজ্ঞবিশেষ। তা, তোমার দাদা যখন একজন যোগ্য ব্যক্তি.........'

'যোগ্য ব্যক্তি আমার দাদা? এই রোগ হবার যোগ্য বলছেন আমার দাদাকে?'

'নয় কেন? অনেক টাকা থাকলেই তো এই রোগে ধরে থাকে। যার ওড়াবার মত অঢেল টাকা আছে, সেই এই রোগ ভোগের যোগ্য। আর, যার তেমন টাকা নেই সেও এতে ভোগে বটে, সেটাও ঐ টাকার লোভেই—সে লোকটা হচ্ছে এই রোগের ভোগ্য। এই রোগে ভুগেই সে কাবার হয়—বুঝেচ?'

'আপনার হেঁয়ালী ঠিক ধরতে পারছি না, মশাই।'

'আরে, অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা জানো না? সেটা ছিল সেই ত্রেতায়, দ্বাপরে। আর এটা হচ্ছে কলিযুগের অশ্বমেধ। শনিবার-শনিবার রেসের মাঠে হয়ে থাকে, যারা সেখানে গিয়ে ঘোড়ার পিছনে ছোটে, তারা বাজি হেরে শেষে সেই মাঠেই শুয়ে পড়ে। ঘোড়াই শুইয়ে দিয়ে যায় তাদের। অশ্বমেধ থেকে যজ্ঞটা তখন রাজসূয় হয়ে দাঁড়ায়। রাজার মতন শুয়ে থাকো তখন—মাঠের ঘাসে। আর ঘাস খাও এন্তার।'

'আরে দূর মশাই! সে ঘোড়ারোগ ধরেনি দাদাকে। দাদার এ রোগটা আজকের নয়। সেবার সেই দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছলাম না আমরা? তখন থেকেই দাদার এই ঘোড়ারোগ।'

'দার্জিলিংয়ে গেছলে—তখনকার ব্যারাম? ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। তোমার কথাটাই আমার হেঁয়ালি বলে বোধ হচ্ছে।'



'দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়া ঘোড়া করে ক্ষেপে গেলেন না আমার দাদা? সেখানে গেলে নাকি ঘোড়ায় চাপতে হয়। ঘোড়ায় চাপা, ঘোড়ায় চেপে বেড়ানো সেখানকার একটা রেওয়াজ নাকি..........এক রকমের বিলাসিতাই!'

'জানি জানি। তা শুধু সেখানকার কেন, সব জায়গারই। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়—সব জায়গায় সবাই।' আমি জানাই।

'দাদাও হলেন, কিনে ফেললেন দু-দুটো ঘোড়া। একটা নিজের জন্য আর একটা আমার জন্য। দাদার এই ঘোড়া রোগের গোড়াটা হচ্ছে সেইখানেই। সেই দার্জিলিংয়েই শুরু।'

'বটে? বটে? দার্জিলিংয়ের আমদানি এই অশ্বরোগ?' কৌতুহলী হই: 'শুনি তো আগাগোড়া?'

গোবর্ধন গোড়ার থেকে ঘোড়ার দিকে আগায়:

'সেই হলো গে গোড়ার গলদ! তারপর থেকেই দাদা ঘোড়ার যতো গলদ বার করতে লাগলেন। নিত্য নতুন খুঁৎ। আর রোজ রোজ খুঁৎ খুঁৎ।

একদিন বললেন—"ঘোড়া দুটো এক সাইজের হয়ে গেলরে—ভারী মুস্কিল হল ত!"

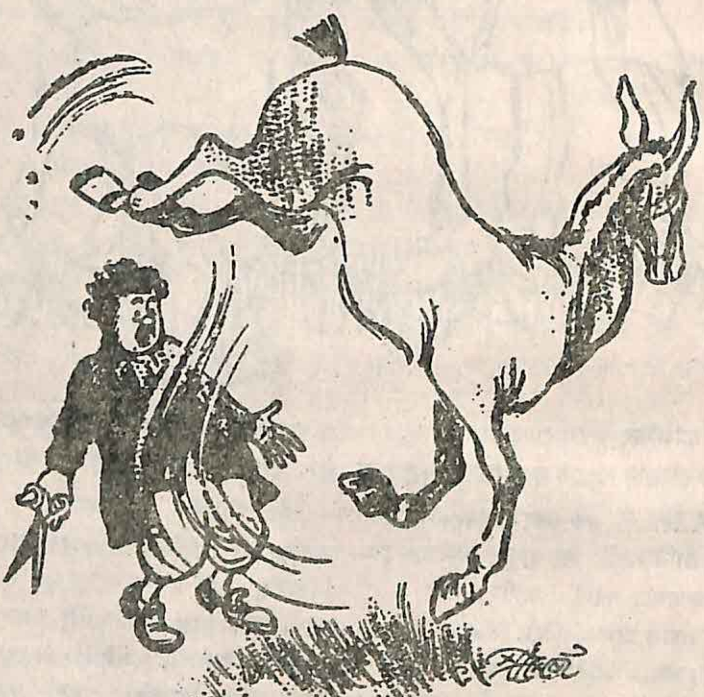
আমি বললাম, "মুস্কিল কিসের দাদা? একসাইজের জন্যেই তো ঘোড়া কেনা। ঘোড়ায় চড়া বেশ ভালো একসাইজ, জানো না, দাদা?"

দাদা বললেন, "আমি আর তা জানিনে! জানি। সে একসাইজের কথা আমি বলছিনে, যার মানে কিনা ব্যায়াম। বলছিলাম যে এক সাইজের—মানে একরকম চেহারার হয়ে গেল। লম্বায় চওড়ায়, আড়ে বহরে, পায়ে মাথায় অবিকল একরকম। আগাপাশতলা সমান—সেই কথাই বলছিলাম আমি।"

আমি তখন বললাম, "তাতে হয়েছে কী, দাদা? ঘোড়া যখন, তখন একরকমই তো হবে।"

দাদা বললেন, "আরে, সব কিছুরই তর তম থাকা দরকার, নইলে তারতম্য বুঝব কিসে? টের পাবো কি করে? যেমন, মহৎ মহত্তর মহত্তম, উচ্চ উচ্চতর, উচ্চতম..........."

"যথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম দাদাকে।



"যেমন ধর, তুই হলি উচ্চ—লম্বায় পাঁচফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। ঘাড়েগর্দানে। আমি আবার তোর চেয়ে ঢ্যাঙ্গা—আমি হলাম উচ্চতর। আর ঐ হিমালয় আমার চেয়েও আবার সমুচ্চ—একেবারে উচ্চতম।.........এই ঘোড়াদুটোর কোন তরতম নেই মোটেই। তোর ঘোড়ার থেকে কি করে আমারটাকে যে আলদা করা যাবে, তাই ভাবছি। যে-ঘোড়া তোর পলকা শরীর বইবে, বয়ে বয়ে হালকা বইবার হ্যাবিট হয়ে যাবে তার, আমি যদি ভুল করে তার পিঠে চেপে বসি কখনো তো অনভ্যাসের দরুন সে হয়ত শুয়েই পড়বে

তক্ষুনি—তারপর হয়ত আর নাও উঠতে পারে। আমার ভার বইতে গিয়ে ইহলীলা সাঙ্গ করে ভব পারাবার পার হয়ে যাবে বেচারা।''

''তাহলে তো ভারী ভাবনার কথা।'' শুনে আমি ভাবিত না হয়ে পারিনা—যেমন ঘোড়ার জন্য, তেমনি নিজের জন্যেও বটে। দাদা চাপলে মারা যদি নাও যায় বেচারা, খোঁড়া হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। আর, খোঁড়া পা খালি খানায় পড়ে কে না জানে? আর পড়লে যে সে খালি নিজেই পড়বে তা নয়, আমাকে নিয়েই পড়বে। আমার কী গতি হবে তখন? আমি একটা উপায় বার করলাম শেষটায়, বললাম, ''দাড়াও, দাদা, আমার ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দিই, তাহলে তো তুমি টের পাবে, চিনতে পারবে সহজেই।'' বলে আমি কাঁচি এনে আমার ঘোড়ার লেজটা কচ্ করে কেটে দিলাম। বললাম, ''তুমি তর-তম চাইছিলে, দাদা, কেমন এইবার তার উত্তর পেলে তো?''

দাদা বললেন, ''তুই যেমন উত্তর দিয়েছিস, আমার ঘোড়াটাকে তেমনি উত্তম করি তাহলে।'' বলে নিজের ঘোড়ার লেজটা বেশ করে পাকিয়ে কষে একটা গিঁট বেঁধে দিলেন তিনি। আর বললেন ''তোর লেজটা তুই যেমন কাঁচিয়ে দিলি, আমারটা তেমনি পাকিয়ে দিলাম।''

তারপর হলো কি একদিন, দুজনে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খাচ্ছিলাম, একটা কাঁটা তারের বেড়ায় লেগে দাদার ঘোড়ার লেজের আধখানা ছিঁড়ে হাওয়া হয়ে গেল। দেখে তো দাদা কেঁদে ফেললেন প্রায়—''দ্যাখ্, কী হোলো আমার লেজের দশা। আমাদের দুজনকার লেজ এখন একাকার হয়ে গেল। আলাদা করে চিনবার আর জো রইল না কোনো।''

আমি বললাম—''দাঁড়াও, আমার ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরগুলো ছেঁটে দিচ্ছি তাহলে।'' ঘোড়ার ল্যোজা মুড়ো দুদিক মুড়িয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম দাদাকে।'

গোবরার দাদৃবাৎসল্যের আমি মনে মনে প্রশংসা না করে পারি না—'তারপর?'

'তারপর আর একদিন আরেক দুর্ঘটনা। পাশাপাশি দুভাই চলেছি ঘোড়ায় চেপে। দাদা আরাম করে ভূটানী চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে যাচ্ছেন—দাদার আনকোরা এক ব্যায়রাম—সেখানকারই আমদানি ব্যায়রামটা—আমি নাক সিঁটকে বললাম, ''ইস্, তোমার এই চুরুটটা কী কড়া গো দাদা, ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়েছে!''

দাদা বললেন, ''হুঁ, গন্ধটা আমিও পাচ্ছি তখন থেকে। কড়ায় গন্ডায় দাম নিয়েছে বলেই কি এত কড়া চুরুট দিতে হয়। এমন কোনো কড়ার তো ছিল না আমার।'' বলে নাক খাড়া করতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ল নিজের ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর—''ওমা! চুরুটের আগুনের ফুলকি লেগে ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশরগুলো পুড়ে শেষ হয়ে গেল যে! গর্দান প্রায় ফাঁক!''

''যাক্, দুজনেরই ঘাড় ফাঁকা হয়ে, একাকার হয়ে গেল দুটো ঘোড়াই।'' আমি বললাম, একটু ভাবিত হয়েই বলতে কি!—''এখন তোমার চাপ থেকে আমার ঘোড়াটাকে বাঁচাই কি করে ভাবছি তাই।''

বেশ ভাবনায় পড়লেন দাদাও। নিজের চাপল্যের কথা ভেবেই বোধ হয়।

''কি করব তাহলে? আমার ঘোড়াটার কান কেটে দেব নাকি?'' বলে যেই না দাদা ঘোড়ার কানে কাঁচি বসাতে গেছেন, ঘোড়াটা অমনি দাদার কথায় কান না দিয়ে এমন

ছুট লাগালো যে, তার দেখাদেখি আমার ঘোড়াটাও তার পিছু পিছু দৌড় মারলো তৎক্ষণাৎ।

তারপর আর ওদের কারোই পাত্তা পেলাম না আমরা। দুজনে মিলে গেলাম তখন সেই ঘোড়াওয়ালার কাছে যে আমাদের বেচেছিল ঘোড়াগুলো। গিয়ে দেখি কি, যে দুটো ঘোড়াই গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে আগের থেকে।

আমাদের কথা শুনে ঘোড়াওয়ালা বললে, ''এ আর এমন কি সমস্যা, বাবু? ঘোড়া দুটোকে আলাদা করে চিনতে চান, এই তো?''

আমরা বললাম, ''হ্যাঁ, তাই।''

সে বললে—''এতো একনজরেই চেনা যায়। ঘোড়াদুটোর ফারাক দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা? একটা ঘোড়া সাদা রঙের আর আর আরেকটা মেটে রঙের—দেখছেন না?

এই সাদামাটা কথাটা মনে থাকলেই তো হোলো। তা আর মনে থাকছে না আপনাদের?''

তখন আমরা ধরতে পারলাম।' বলে হাঁপ ছাড়ল গোবর্ধন।

'তা তো ধরলে।' আমি বললাম—'কিন্তু এর থেকে ঘোড়ার ব্যায়রামের কিছুই ত আমি ধরতে পারছি না।'

'ব্যায়রামটা ধরল তারপরই। ফেরবার সময় ঘোড়া দুটোকে আমরা সঙ্গে করে আনলাম ত। এই কলকাতায় আসার পর থেকেই শুরু হোলো দাদারটার যতো ব্যায়রাম। আজ সর্দি, কাল কাশি, পরশু পেটের অসুখ লেগেই আছে। দিনরাত হ্যাঁচোর হ্যাঁচোর ফ্যাচোর ফ্যাচোর। আর ঘোড়ার একেকটা হ্যাঁচি! বব্বাঃ! আমাদের একশটা হাঁচির সমান। ঘরদোর কাঁপিয়ে দেয়। রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে যায় আমাদের ওর হাঁচির আওয়াজে।'

'বলো কি হে?'

'হ্যাঁ দাদা। দার্জিলিঙে গিয়ে যেরকমটা আমাদেরও গোড়ায়......আমাদের ঠান্ডা লেগে হয়েছিল, আর ওদের হয়ত ঠান্ডার দেশ থেকে গরমে এসে পড়ায় তাই হয়েছে।'

'তোমার ঘোড়াটারও তাই হয়েছে নাকি?'

'না, আমার ঘোড়ার ততটা নয়। হবার শুরুতেই ওর কানের গোড়ায় গিয়ে বলে দিলাম, ''শোনো বাপু, দিনরাত এমন ফ্যাচর ফ্যাচর আমার ভালো লাগে না। এরকম করলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে ভাগিয়ে দেব বাড়ি থেকে।'' শুনেই না সমঝে নিয়ে শুধরে গিয়েছে ঘোড়াটা। কিন্তু দাদার ঘোড়া একটু আদুরে তো, দাদার আদর পেয়ে পেয়ে বখে গিয়ে এখন উচ্ছন্নে যাবার পথে। দাদাকেও তার সঙ্গে নিয়ে চলেছে এখন।''

'এতো হোলো গে ঘোড়ার ব্যারাম। এই সঙ্গে তোমার দাদার কি? তোমার দাদার হল ঘোড়া-রোগ, মানে, ঘোড়াটাই রোগ আর এ হোলো গিয়ে ঘোড়ার রোগ। একটা মনের, একটা দেহের—আলাদা জিনিস। দুজনের রোগের মিলটা কোনখানে?'

'লক্ষণে মিলছে।' ব্যক্ত করে গোবরা, 'ঘোড়াটা যেমন হাঁচছে, কাশছে, ফ্যাচর ফ্যাচর করছে, তেমনি দাদাও করছেন কাল থেকে। ঘোড়াটার মতই কেঁপে কেঁপে উঠছেন মাঝে মাঝে.........'

'কামড়ে দেয়নি ত ঘোড়াটা? তাহলে ঘোড়ার ব্যায়রাম তোমার দাদায় সংক্রামিত হতে পারে বটে। কিন্তু তাহলেও এটা হাইড্রোফোবিয়া নয়, যদ্দুর মনে হয়।'

'হাইড্রোফোবিয়া?' শুনে হতবাক হয় গোবর্ধন। 'সে আবার কি?'



'সেটা ঠিক অশ্ব রোগ নয়, শ্বরোগ বলতে পারো বরং। কুকুরদের হয়। হলে পরে তারা জল খায় না, জল দেখলে ভয় খায়। আর সেই কুকুর মানুষকে কামড়ালে তারও ফের সেই রোগ হয়ে থাকে, উপরন্তু সেও কুকুরের মতই ঘেউ ঘেউ করে আবার। তবে বেশিদিন করে না, তারপরই মারা পড়ে যায় কিনা।

'কি সর্বনাশ!' শুনেই গোবরা আঁতকে ওঠে।

'ঘোড়ায় কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া ঠিক না হলেও সেই ধরনের কিছু একটা হতে পারে বা, তোমার দাদা কি ঘোড়ার মত ডাক ছাড়লেন? চিঁহি চিঁহি করছেন নাকি?'

'এখনো করেনি। তবে করবে হয়ত।'

'ঘাস রেখে দেখো তো তোমার দাদার সামনে। ঘাস খায় কি না দেখো তো। যদি ঘাস না খায়, খেতে না চায়, ঘাসে যদি তাঁর অরুচি দেখা যায়, তাহলে একটু ভয়ের কথাই বই কি।'

শুনে গোবরা আর দাঁড়ায় না। 'রাম ডাক্তারকে কল দিতে যাচ্ছি তাই।' ছুটতে ছুটতে বলে। আর বলতে বলতে ছোটে।

একটু বাদেই হর্ষবর্ধন এসে পড়েন, হাঁচতে হাঁচতে কাশতে কাশতে আর কম্পিত কলেবরে—ঠিক যেমনটি জানিয়েছিল গোবরা।

'গোবরার ফিরতে দেরি হেচ্ছে দেখে আমি নিজেই চলেছি রাম ডাক্তারের কাছে। কল

দিতে যাচ্ছি তাকে।' বিকল হয়ে তিনি জানান।

'চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।'

ডাক্তারের সামনে হাজির হয়েই হর্ষবর্ধন বেআক্কার হয়ে পড়লেন। হাঁচতে লাগলেন এক নাগাড়ে।

হ্যাঁচ্চো.....হ্যাঁচ্চো......হ্যাঁচ্চো......

'দাঁড়ান দাঁড়ান, হচ্ছে কি এ! হাঁচছেন কেন এমন করে?' রাম ডাক্তার জানতে চান।

'আমি......আমি কি......হ্যাঁচ্চো......ইচ্ছে করে.....হ্যাঁ......হ্যাঁ.....হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্ছো......ইচ্ছে করে হাঁচছি নাকি?'

হাঁচতে হাঁচতে তিনি বললেন। বলতে বলতে হাঁচতে লাগলেন। আর কাঁপতে লাগলেন সেই সঙ্গে।

দাদাকে কম্পান্বিত দেখে গোবর্ধন, সেখানে সে খাড়া ছিল আগের থেকেই, ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বসে বসে হাঁচতে থাকলেন দাদা!

'কী সর্বনাশ! আপনার হাঁচির চোটে আমার টেবিলের কাগজপত্র সব উড়ে গেল! কী বিদ্‌ঘুটে হাঁচি মশাই আপনার। এতকাল ধরে ডাক্তারি করছি। কিন্তু এমন সর্বনেশে হাঁচি আমি কখনো দেখিনি। মানুষে এমন হাঁচতে পারে? অ্যাঁ?'

'ঘোড়ায় পারে ডাক্তারবাবু।' দাদার হয়ে জবাব দিল ভাইটি, 'ঘোড়ার হাঁচি হাঁচছে যে দাদা।'

'ঘোড়ার হাঁচি না হলেও ঘোরতর হাঁচি যে তার ভুল নেই।' বলেন রাম ডাক্তার: 'এই হাঁচিটা হয়েছে কবের থেকে?'

হর্ষবর্ধন জবাব দিতে যান, কিন্তু পেরে ওঠেন না, উলটে আরো বিস্তর হাঁচি পেড়ে বসেন।

'কাল থেকে হয়েছে, আর সেই ঘোড়ার থেকেই।' জানিয়ে দেয় গোবরাই।—'ঘোড়ারোগে ধরেছে আমার দাদাকে। মানে, সেই ঘোড়াটার ব্যায়রামে, বুঝলেন ডাক্তারবাবু?'

'ঘোড়ার ব্যায়রামে? কেন, ঘোড়াকে তো আমি কালকেই ওষুধ দিয়েছি, সেই ওষুধ কি তাকে খাওয়ানো হয়নি তাহলে?

'খাইয়েছিলাম তো.......হ্যাঁচ্ছো.......খাওয়াতে গেছলাম.......কিন্তু হ্যাঁচ্ছো........ ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়ানো কি সোজাকথা মশাই.......হ্যাঁচ্ছো.......হ্যাঁচ্ছো........তাকে খাওয়াবো কি......হ্যাঁচ্ছো.......তাকে খাওয়াতে গিয়ে না আমাকেই.......হ্যাঁচ্ছো........গিলে বসতে হয়েছে সেই ওষুধ! হ্যাঁচ্ছো।'

'অ্যাঁ? কী সর্বনাশ! ঘোড়ার ওষুধ আপনি খেয়ে বসে আছেন! তাহলে তো ঠিকই হয়েছে। ঘোড়ার ওষুধ খেলে যে ঘোড়ার রোগে ধরবে সে বেশি কী! যে ওষুধে ঘোড়া সারে, মানুষকে তা একেবারে সেরে দেয়। কিন্তু কেন? ঘোড়াকে না খাইয়ে আপনি নিজে খেতে গেলেন কেন?' বিস্মিত হয়ে তিনি শুধোন।

'আমি কি ইচ্ছে করে......হ্যাঁচ্ছো......ইচ্ছে করে খেয়েছি নাকি?' ততক্ষনে অনেকটা

সামলে উঠেছেন হর্ষবর্ধনঃ 'ঘোড়াকেই তো খাওয়াতে গেছলাম, কিন্তু ঘোড়া কি খেতে চায় নাকি? তাকে ওষুধ খাওয়ানো কি সোজা মশাই? হাঁ করতেই চায় না ঘোড়া।'

'আহা! হাঁ করাতে যাবেন কেন? আপনাকে একটা লম্বা কাঁচের নল দিলাম না? বললাম না যে, ওষুধের পাউডারটা সেই নলের ভেতর ভরে ঘোড়ার নাকের মধ্যে গলিয়ে দেবেন, তারপর সেই নলটার অপর দিকে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিলেই সেই ওষুধ ঘোড়ার নাকের গর্ত দিয়ে গিয়ে, গলা দিয়ে গলে, পেটের তলায় চলে যাবে ওষুধ, বললাম না?'

'বলেছিলেন ত! ওর নাকেও বসিয়েছিলাম নলটা সেইরকম.......কিন্তু........হ্যাঁ........কিন্তু হ্যাঁচ্ছো........' হাঁচতে হাঁচতে কাঁপতে কাঁপতে ব্যক্ত করেন হর্ষবর্ধন—'কিন্তু আমার ফুৎকারের আগে.......হ্যাঁচ্চো.......পাজি ঘোড়াটা আগেই ফুঁ দিয়ে বসল যে!'



হর্ষবর্ধনের সূর্য-দর্শন

সূর্যদর্শন না বলে সূর্যগ্রাস বললেই ঠিক হয় বোধ হয়।

রাহুর পরে এক মহাবীরই যা সূর্যদেবকে বগলদাবাই করেছিলেন, কিন্তু যত বড় বীরবাহুই হন না, হর্ষবর্ধনকে হনুমানের পর্যায়ে কখনো ভাবাই যায় না।

তাই তিনি যখন এসে পাড়লেন, 'সূয্যি মামাকে দেখে নেব এইবার', তখন বলতে কি, আমি হাঁ হয়ে গেছলাম।

আমার হাঁ-কারের কোনো জবাব না দিয়েই তিনি দ্বিতীয় হেঁয়ালি পাড়লেন, 'সুন্দরবনের বাঘ শিকার তো হয়েছে, চলুন এবার পাহাড়ে বাঘটাকে দেখে আসা যাক।'

'যদ্দুর আমার জানা,' না বলে আমি পারলাম না, 'বাঘরা পাহাড়ে বড় একটা থাকে না। বনে জঙ্গলেই তাদের দেখা মেলে। হাতীরাই থাকে পাহাড়ে। পাহাড়দের হাতীমার্কা চেহারা—দেখেছেন তো!'

'কে বলেছে আপনাকে?' তিনি প্রতিবাদ করলেন আমার কথার, 'টাইগার হিল তাহলে বলেছে কেন? নাম শোনেন নি টাইগার হিলের?'

'শুনব না কেন? তবে সে হিলে, যদ্দূর জানি, কোনো টাইগার থাকে না। বাবুরা বেড়াতে যান।'

'সূয্যিঠাকুর সেই পাহাড়ে ওঠেন রোজ সকালে। সে নাকি অপূর্ব দৃশ্য!'

'তাই দেখতেই তো যায় মানুষ।'

'আমরাও যাব। আমি, আপনি আর গোবরা। এই তিনজন।'

বিকেলের দিকে পৌঁছলাম দার্জিলিঙে। টাইগার পাহাড়ের কাছাকাছি এক হোটেলে ওঠা গেল।

খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে হোটেলের মালিককে অনুরোধ করলাম—'দয়া করে আমাদের কাল খুব ভোরের আগে জাগিয়ে দেবেন.....'

'কেন বলুন ত?'

আমরা এক-একটি ঘুমের ওস্তাদ কিনা, তাই বলছিলাম........'

'ঘুম পাহাড়ও বলতে পারে আমাদের।' বললেন হর্ষবর্ধন—'যে ঘুম পাহাড় খানিক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমরা। তাই আমাদের বলতে পারেন। আমাদের এই পাহাড়ে ঘুম সহজে ভাঙবার নয় মশাই।'

'নিজগুণে আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারব না,' গোবরাও যোগ দিল আমাদের কথায়—'তাই আপনাকে এই অনুরোধ করছি.......'

'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণ। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, অ্যাদ্দুরে এসেছি কেবল সূর্যোদয় দেখবার জন্য।'

সূর্যোদয় দেখবার জন্য? কেন, কলকাতায় কি দেখা যায় না? সেখানে কি সূর্য ওঠে না নাকি?'

'উঠবে না কেন, কিন্তু দর্শন মেলে না। চার ধারেই এমন উঁচু উঁচু সব বাড়িঘর যে, সূয্যি ঠাকুরের ওঠানামার খবর টের পাবার জো নেই।'

'তাছাড়া, তালগাছও তো নেইকো কলকাতায়, থাকলে না হয় তার মাথায় উঠে দেখা যেত........' গোবরা এই তালে একটা কথা বলল বটে তালেবরের মতন!

'তাল গাছ না থাক্, তেতালা বাড়ি আছে তো? তার ছাদে উঠে কি দেখা যেত না?' বলতে চান ম্যানেজার।

'থাকবে না কেন তেতালা বাড়ি। তেতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল সবরকমের বাড়িই আছে।' বলে হর্ষবর্ধন তাঁর উল্লিখিত শেষের বাড়ির বিশদ বর্ণনা দেন, 'ঝাঁপতাল বাড়ি মানে যেসব সাত-দশ তলা বাড়ির থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার তালে ওঠে মানুষ, তেমন তেমন বাড়িও আছে বই কি! কিন্তু থাকলে কি হবে, তাদের ছাদে উঠেও বোধ হয় দেখা যাবে না সূর্যোদয়। দূরের উঁচু উঁচু বাড়ির আড়ালেই ঢাকা থাকবে পূব আকাশ।'

'এক হয়, যদি মনুমেন্টের মাথায় উঠে দেখা যায়......' আমি জানাই।

'তা সেই মনুমেন্টের মাথায় উঠতে হলে পুরো একটা দিন লাগবে মশাই আমার এই দেহ নিয়ে...... দেহটা দেখেছেন?'

হর্ষবর্ধনের সকাতর আবেদনে হোটেলের মালিক তাঁর দেহটি অবলোকন করেন। তারপরে সায় দেন—'তা বটে।'

'তবেই দেখুন, এজন্মে আমার সূর্যোদয়ই দেখা হচ্ছে না তাহলে—এই মানবদেহ ধারণ বৃথাই হলো........'

'তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ.........'

'এখানে নাকি অবাধে সূর্যোদয় দেখা যায়, আর তা নাকি একটা দেখবার জিনিস সত্যিই........'

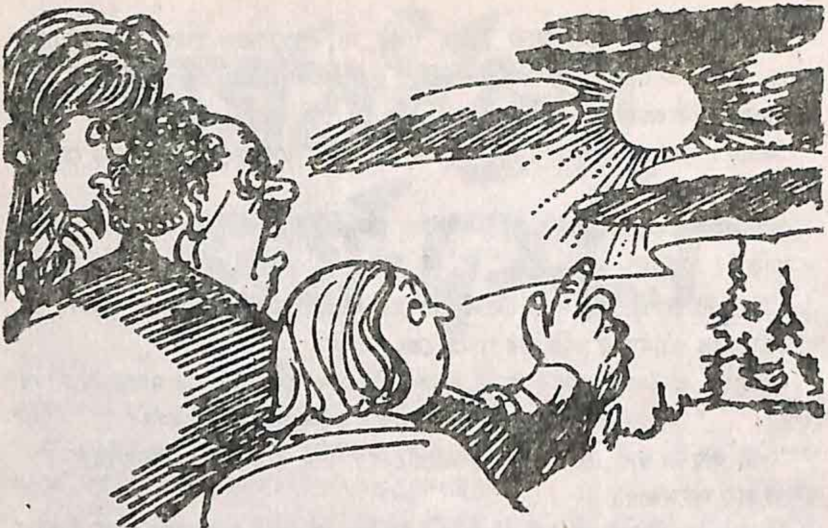
'সেই কারণেই আপনাকে বলছিলাম......'

আমাদের যুগপৎ প্রতিবেদন—'দয়া করে আমাদের ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে তুলে দেবেন। এমনকি, দরকার হলে জোর করেও।'

'কোনো দরকার হবে না।' তিনি জানান, 'রোজ ভোর হবার আগে এমন সোরগোল বাধে এখানে যে তার চোটে আপনার থেকেই ঘুম ভেঙে যাবে আপনাদের।'

'সোরগোলটা বাধে কেন?'

'কেন আবার? ঐ সূর্যোদয় দেখবার জন্যেই। যে কারণে যেই আসুক না, হাওয়া খেতে কি বেড়াতে কি কোনো ব্যবসার খাতিরে, ঐ সূর্যোদয়টি সবারই দেখা চাই। হাজার বার দেখেও আশ মেটে না কারো। একটা বাতিকের মতই বলতে পারেন।'



'আমরাও এখানে চেঞ্জে আসিনি, বেড়াতে কি হাওয়া খেতেও নয়—এসেছি ঠিক ঐ কারণেই.......।

'তাই রোজ ভোর হবার আগেই হোটেলের বোর্ডাররা সব গোল পাকায়, এমন হাঁকডাক ছাড়ে যে, আমরা, মানে, এই হোটেলের কর্মচারীরা, যারা অনেক রাতে কাজকর্ম সেরে ঘুমতে যায় আর অত ভোরে উঠতে চায় না, সূর্য ভাঙিয়ে আমদের ব্যবসা হলেও সূর্য দেখার একটুও গরজ নেই যাদের, একদম সেজন্য ব্যাতিব্যস্ত নয়, তাদেরও বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয় ঐ হাঁকডাকের দাপটে। কাজেই আপনাদের কোনো ভাবনা নেই, কিছু করতে হবে না আমাদের। কোনো বোর্ডারকে আমরা ডিসটার্ব করতে চাইনে, কারো বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো আমাদের নিয়ম নয়........ তার দরকারও হবে না, সাত সকালের সেই গোলমালে আপনাদের ঘুম যতই নিটোল হোক না কেন, না ভাঙলেই আমি অবাক হব।'

অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের ঘরে আমাদের মালপত্র রেখে বিকেলের জলযোগ পর্ব চা—টা সেরে বেড়াতে বেরুলাম আমরা।

তখন অবিশ্যি সূর্যোদয় দেখার সময় ছিল না, কিন্তু তা ছাড়াও দেখবার মতো আরো নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মজুদ ছিল তো! সেই সব অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতেই আমরা বেরুলাম।

সন্ধ্যে হয় হয়। এ ধারের পাহাড়ে পথঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকাই এখন। একটা ভুটিয়ার ছেলে একপাল ভেড়া চরিয়ে বাড়ি ফিরছে গান গাইতে গাইতে।

শুনে হর্ষবর্ধন আহা-উহু করতে লাগলেন।

'আহা আহা! কী মিষ্টি! কী মধুর.........'

'কেমন মূর্ছনা!' যোগ দিল গোবরা। শুনে প্রায় মূর্ছিত হয় আর কি!

'একেই বলে ভাটিয়ালি গান, বুঝেছিস গোবরা? কান ভরে শুনে নে, প্রাণ ভরে শোন্।'

'ভাটিয়ালি গান বোধ হয় এ নয়', মৃদু প্রতিবাদ আমার—'সে গান গায় পুব বাংলায়

মাঝিরা, নদীর বুকে নৌকার ওপর বৈঠা নিয়ে বসে। ভাটির টানে গাওয়া হয় বলেই বলা হয় ভাটিয়ালি।'

'তাহলে এটা কাওয়ালি হবে।' সমঝদারের মতন কন হর্ষবর্ধন।

'তাই বা কি করে হয়? গোরু চরাতে চরাতে গাইলে তাই হত বটে, কিন্তু cow ত নয়, ওতো চরাচ্ছে ভেড়া।'

'কাওয়ালিও নয়?' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষুণ্ণ হন।

'রাখালী গান বলতে পারো দাদা!' ভাই বাতলায়, 'ভেরা চরালেও রাখালই ত বলা যায় ছোঁড়াটাকে।'

'লোকসঙ্গীতের বাচ্চা বলতে পারেন।' আমিও সঙ্গীতের গবেষণায় কারো চাইতে কম যাই না, 'এই বেড়ালই যেমন বনে গেলে বনবেড়াল হয়। তেমনি এই বালকই বড় হয়ে একদিন কেষ্ট বিষ্টু একটা লোক হবে। অন্ততঃ ওর গোঁফ বেরুবে তখন এই গানকে অক্লেশে লোকসঙ্গীত বলা যাবে। এখন নেহাৎ বালকসঙ্গীত।'

ভেড়ার পাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে ছেলেটা কাছিয়ে এলে হর্ষবর্ধন নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন—ওকে কিছু বকশিশ্ দেওয়া যাক্। ওমা! আমার মনিব্যাগটা তো হোটেলের ঘরে ফেলে এসেছি দেখছি। আপনার কাছে কিছু আছে? নাকি, আপনিও ফেলে এসেছেন হোটেলে?'

'পাগল! আমি প্রাণ হাত ছাড়া করতে পারি, কিন্তু পয়সা নয়। আমার যৎসামান্য যা কিছু আমার সঙ্গেই থাকে—আমার পকেটই আমার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে কিনা.......'

বলতে গিয়েও বাধে আমার। চক্রবর্তীরা যে কঞ্জুষ হয়, সে কথা মুখ ফুটে বলি কি করে? নিজ গুণ কি গণনা করবার?

'তাহলে ওকে কিছু দিন মশাই! একটা টাকা অন্ততঃ।'

দিলাম।

টাকাটা পেয়ে ত ছেলেটা দস্তুরমতন হতবাক্। পয়সার জন্যে নয়, প্রাণের তাগাদায় অকারণ পুলকেই গাইছিল সে। তাহলেও খুশী হয়ে, আমাদের সেলাম বাজিয়ে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সে চলে গেল।

খানিক বাদের সেই পথে আবার এক রাখাল বালকের আবির্ভাব! সেই ভেড়ার পাল নিয়ে সেই রকম সুর ভাঁজতে ভাঁজতে........ তাকেও এক টাকা দিতে হয়।

খানিক বাদে আবার আরেক! পঞ্চম স্বরে গলা চড়িয়ে ভেড়া চরিয়ে ফিরছে ঐ পথেই। তার স্বরঘাতের হাত থেকে রেহাই পেতে, অর্ধচন্দ্র দেওয়ার মতই, একটা আধুলি দিয়ে তাকে বিদায় করা হল।

তারপর আরো আরো আরো মেষপালকের গাইয়ে বালকের পাল আসতে লাগল পরম্পরায়........ ঐ পথেই! আর আমিও তাদের বিদায় দিতে লেগেছি। তিনটেকে আধুলি, চারটেকে চার আনা করে, বাকীগুলোকে পুঁজি হালকা হওয়ার হেতু বাধ্য হয়েই দশ নয়া পাঁচ নয়া করে দিয়ে তাদের গন্তব্য পথে পাচার করে দিতে হোলো।

'সেই একটা ছেলেই ঘুরে ঘুরে আসছে নাতো দাদা?' গোবরা সন্দেহ করে শেষটায়—'পয়সা নেবার ফিকিরে?'

'সেই একটা ছেলেই নাকি মশাই ?' দাদা শুধান আমায়।

'কি করে বলব ? একটা ভুটিয়ার থেকে আরেকটা ভুটিয়াকে আলাদা করে চেনা আমার পক্ষে শক্ত। এক ভেড়ার পালকে আরেক পালের থেকে পৃথক্ করাও কঠিন। আমার কাছে সব ভেড়াই একরকম। এক চেহারা।'

'বলেন কি ?' হর্ষবর্ধন তাজ্জব হন।

—'হ্যাঁ, সব এক ভ্যারাইটি। যেমন এক চেহারা তেমনি এক রকমের স্বরলহরী—কি ভেড়ার আর কী ভুটিয়ার!'

'আসুন তো, এই পাশের টিলাটার ওপর উঠে দেখা যাক ছেলেটা যায় কোথায়!'

ছেলেটা যেতেই আমরা টিলাটার ওপরে উঠলাম।

ঠিকতাই। ছেলেটা এই টিলাটার বেড় মেরেই ফের আসছে ফের ঘুরে...... গলা ছেড়ে দিয়ে সুরের সপ্তমে।

কিন্তু এবার আর সে আমাদের দেখা পেল না।

না পেয়ে, টিলাটাকে আর চক্কর না মেরে তার নিজের পথ ধরল সে। তার চক্রান্তের থেকে মুক্তি পেলাম আমরাও।

কিন্তু ছেলেটা আমাকে কপর্দকশূন্য করে দিয়ে গেল। আরেকটু হলে তার গানের দাপটে আমার কানের সব কটা পর্দাই সে ফাটিয়ে দিয়ে যেত। তাহলেও, কানের সাত পর্দার বেশ কয়েকটাই সে ঘায়েল করে গেছে, শেষ পর্দাটাই বেঁচে গেছে কোন রকমে। আমার মত আমার কানকেও কপর্দকশূন্য করে গেছে।

তাহলেও কোনো গতিকে কানে কানে বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়।

প্রাকৃতিক মাধুরীর প্রচুর ভুরিভোজের পর বহুৎ হন্টন করে হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

তখন ঘুম আমাদের চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলছে। কোনো রকমে কিছু নাকে মুখে গুঁজেই আমাদের ঘরের ঢালাও বিছানায় গিয়ে আমরা গড়িয়ে পড়লাম।

'গোবরাভায়া, দরজা জানালা খড়খড়ি ভালো করে এঁটে দাও সব। নইলে কোনো ফাঁক পেলে কখন এসে বৃষ্টি নামবে, তার কোনো ঠিক নেই।' বললাম আমি গোবর্ধনকে।

'এটা তো বর্ষাকাল নয় মশাই।'

'দার্জিলিংয়ের মেজাজ তুমি জানো না ভাই। এখানে আর কোনো ঋতু নেই, গ্রীষ্ম নেই, বসন্ত নেই, শরৎ নেই, হেমন্ত নেই, খালি দুটো ঋতুই আছে কেবল। শীতটা লাগাও, আর বর্ষণ যখন তখন।'

'তার মানে ?'

'চার ধারেই হালকা মেঘ ঘুরছে ফিরছে—নজরে না ঠাওর হলেও। মেঘলোকের উচ্চতাতেই দার্জিলিং তো! জানলা খড়খড়ির ফাঁক পেলেই ঘরের ভেতর সেই মেঘ এসে বৃষ্টি নামিয়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'বলেন কি ?'

'তাই বলছি।' আমি বললাম—'কিন্তু আর বলতে পারছি না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম.........'

'ঘুমোচ্ছেন তো! কিন্তু চোখ কান খোলা রেখে ঘুমোবেন।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধন।

'তেমন করে কি ঘুমোনো যায় নাকি?' আমি না বলে পারি না—'চোখ তো বুজতে হবে অন্ততঃ।'

'কিন্তু কান খাড়া রাখুন। কান খোলা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমোন। একটু সোরগোল কানে এলেই বুঝবেন ভোর হয়েছে। জাগিয়ে দেবেন আমাদের।'



'দেখা যাবে।' বলে আমি পাশ ফিরে শুই। কান দিয়ে কদ্দূর কতটা দেখতে পারব, তেমন কোনো ভরসা না করেই।

এক ঘুমের পর কেমন যেন একটা আওয়াজে আমার কান খাড়া হয়। আমি উঠে বসি বিছানায়। পাশে ঠেলা দিই গোবরাকে—'গোবরা ভায়া, একটা আওয়াজ পাচ্ছ না?'

'কিসের আওয়াজ?'

'পাখোয়াজ বাজছে যেন। কেউ যেন ভৈরোঁ রাগিণী সাধছে মনে হচ্ছে। ভৈরোঁ হোলো গে ভোরবেলার রাগিণী। ভোরবেলায় গায়।'

'পাখোয়াজ বাজছে?' গোবরাও কান তুলে শোনবার চেষ্টা পায়।

হর্ষবর্ধনও সাড়া দেন ঘুম থেকে উঠে—'কী হয়েছে? ভোর হয়েছে নাকি?'

'খানিক আগে কি রকম যেন একটা সোরগোল শুনছিলাম।'—আমি বললাম।

'ভোর হয়েছে বুঝি?'

'ভাবছিলুম তাই। কিন্তু আর সেই হাঁকডাকটা শোনা যাচ্ছে না।'

'শুনবেন কি করে?' বলল গোবরা—'দাদা জেগে উঠলেন যে! দাদাই তো নাক ডাকাচ্ছিলেন এতক্ষণ।'

'কক্ষণো না। বললেই হোলো! কখনো আমার নাক ডাকে না, ডাকলে আমি শুনতে পেতুম না নাকি? ঘুম ভেঙে যেত না আমার?'

'তুমি যেন বদ্ধকালা। শুনবে কি করে? নইলে কানের অত কাছাকাছি নাক! আর ওই ডাকাতপড়া হাঁক তোমার কানে যেত না?'

'তুই একটা বদ্ধ পাগল! তোর সঙ্গে কথা কয়ে আমি বাজে সময় নষ্ট করতে চাই নে।' বলে দাদা পাশ ফিরলেন—আবার তাঁর হাঁকডাক শুরু হোলো।

এরপর, অনেকক্ষণ পরেই বোধহয়, হর্ষবর্ধনই জাগালেন আমাদের—'কোনো সোরগোল শুনছেন?'

'কই না তো।' আমি বলি—'বিলকুল চুপচাপ।'

'এতক্ষণেও ভোর হয়নি! বলেন কি! জানালা খুলে দেখা যাক তো......' তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালাটা খুললেন—'ওমা! এই যে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে........উঠুন! উঠুন!! উঠে পড়ুন চটপট।'

আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

'জামা কাপড় পরে না! সাজগোজ করার সময় নেই—তাছাড়া দেখতেই যাচ্ছেন, কাউকে দেখাতে যাচ্ছেন না। নিন, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। দেরি করলে সূর্যোদয়টা ফস্‌কে যাবে।'

তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টাইগার হিলের উঁচু টিলাটা কাছেই। হন্তদন্ত হয়ে তিনজনায় গিয়ে খাড়া হলাম তার ওপর।

বিস্তর লোক গিজ্‌গিজ্ করছে সেখানে। নিঃসন্দেহ, সূর্যোদয় দেখতে এসেছে সবাই।

'মশাই! সূয্যি উঠতে দেরি কত?' হর্ষবর্ধন একজনকে শুধালেন।

সূয্যি উঠতে?' ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে ওঁর কথার জবাব দিলেন।

'বেশি দেরি নেই আর।' আমি বললাম—'আকাশ বেশ পরিষ্কার। দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত.......... উঠলো বলে মনে হয়।'

কিন্তু সূর্য আর ওঠে না। হর্ষবর্ধন বাধ্য হয়ে আরেকজনকে শুধান—'সূয্যি উঠচে না কেন মশাই?'

'এখন সূর্য উঠবে কি?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকান তার দিকে।

'মানে, বলছিলাম কি, সূর্য তো ওঠা উচিত ছিল এতক্ষণ। পূবের আকাশ বেশ পরিষ্কার। সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে—অথচ সূর্যের পাত্তা নেই!'

'সূর্য কি উঠবে না নাকি আজ?' আবার অনুযোগ।

'ঐ মেঘটার আড়ালে ঢাকা পড়ছে সূর্য, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।' তিনি জানালেন—'মেঘটা সরে গেলেই ......'

বলতে বলতে মেঘ সরে গেল, প্রকাশ পেলেন সূর্যদেবের?'

'ও বাবা! অনেকখানি উঠে পড়েছেন দেখছি। বেলা হয়ে গেছে বেশ।' আপসোস করলেন হর্ষবর্ধন— 'সূর্যোদয়টা হাতছাড়া হয়ে গেল দেখছি আজ।'

'ওমা! একি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি— নেমে যাচ্ছে যেন! নামছে কেন সূয্যিটা? নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে যে! একী ব্যাপার?'

'এরকমটা তো কখনো হয় না!' আমিও বিস্মিত হই—'সূর্যের এমন বেচাল ব্যাপার তো দেখা যায় না কখনো।'

'হ্যাঁ মশাই, এরকমটা হয় নাকি এখানে মাঝে মাঝে? একটু না উঠেই নামতে থাকেন আবার—পথ ভুল হয় সূর্যদেবের?''

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সূর্যোদয় দেখতে এসেছি কিনা, উদীয়মান সূর্য দেখতে না পাই, উদিত সূর্য দেখেও তেমন বিশেষ দুঃখিত হইনি—কিন্তু একি! উঠতে না উঠতেই নামতে লাগলো যে!'

'আপনার জন্যে কি পশ্চিম দিকে উঠবে নাকি সূর্য? অস্ত যাবার সময় সূর্যোদয় দেখতে এসেছেন!' ঝাঁঝালো গলা শোনা যায় ভদ্রলোকের—

'কোথাকার পাগল সব!' আরেক জন উতোর গান তাঁর কথার।





হর্ষবর্ধনের শ্রমদানের এক কাহিনী। শ্রমদান না বলে শ্রমের জন্য দান বলাটাই ঠিক।

বিনা স্বার্থে বা পারিশ্রমিকে পরের কর্মে নিজের ঘর্মদানকেই শ্রমদান বলে থাকে বোধ হয়? ভূদান মার্কা দান খয়রাৎ, এটা একে বারেই কোনো ভূয়ো ব্যাপার নয়—ভূয়োদর্শী মাত্রই জানেন!

কিন্তু এক্ষেত্রে কি উল্টোটাই ঘটেছিল। পরের শ্রমের জন্য বা পরিশ্রমের হেতু হর্ষবর্ধন দান করেছিলেন। সেই দানটা আবার নানান আদান-প্রদানে অনেকের বিনাশ্রমে অল্পবিস্তর প্রাপ্তিযোগের কারণ হয়েছিল, বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে যোগাযোগের সেই অকিঞ্চিৎকর বৃত্তান্ত এই........

কী করে ঘটলো বলি.......

চেতলার কারখানায় গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন এক কাণ্ড করে বসেছেন। নিজের গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

দৃশ্যটা বিস্ময়কর, কেননা হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধে এহেন স্বকপোল-কল্পনা আমি ধারণাও করতে পারিনা। নিজের গাল হস্তগত করতে কখনও আমি তাঁকে দেখিনি, অবশ্যি পরহস্তগত হতেও দেখিনি যদিও, তাহলেও নিজের গালে হস্তক্ষেপ করতে কাউকে কখনও দেখা যায় কি?

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের গালে আদরের ছলে বড়দের স্থূল হস্তাবলেপ হতে দেখা যায় সময় সময়, আবার চপেটাঘাতের তালে পরের গালে চড়-চাপড়ের পালা পড়তেও দেখা গেছে, কিন্তু আত্মচর্চায় নিজের গাল হাতাতে কাউকে আমি দেখিনি কখনো।

'গালে হাত দিয়ে এত কী ভাবছেন মশাই?' আমি শুধালাম।

'গালে নয়, আমার কপালে হাত পড়েছে।....... ভাবনায় পড়েছি ভারী।' বলে তেমনি ভারিক্কি এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'পেটে না হাত পড়ে শেষটায়।'

'তার মানে?'

'আমার এই কারখানায় বানানো যত আসবাব পত্র দেখছেন না? এইসব হাল ফ্যাশানের আনকোরা ডিজাইনের নিত্যনতুন কায়দায় দেখছেন যত না—এসব আর চলছে না আজকাল।

লোকের রুচি পাল্টাচ্ছে।'

'সে কি! আপনার এই সব চমৎকার তক্তপোষে শুয়ে আরাম পাচ্ছে না কেউ? ঘুম হচ্ছে না তাদের?'

'কোথায় হচ্ছে আর!' আবার তাঁর নাসারন্ধ্রের পথে আরেক ফুৎকার!

'বলেন কি মশাই! এমন চমৎকার কারুকার্যকরা তক্তপোষে শুয়েও ঘুম হচ্ছে না কারো!' শুনেই আমি হতবাক : 'আমার তো মশাই, যেকোনো তক্তপোষ পেলেই ঘুম এসে যায়, অবশ্যি যদি তার ওপর গদির আপোস থাকে আর পেটের ভিতর উপোস না থাকে!'

'দূর মশাই! আপনার খালি খাই আর শুই! খাওয়া আর শোওয়ার ধান্দাতেই রয়েছেন কেবল। দুনিয়ার সবাই আপনার মতন নয়। তাদের মন আছে। মন বলে একটা পদার্থ আছে তাদের।'

'তা, কী হয়েছে তাদের?'

'মন থাকলেই রুচি থাকে। মন বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে রুচি পালটে যায়। ফ্যাশানের মোড় ঘোরে। জানেন এসব? খবর রাখেন এর?'

'আজ্ঞে না।'

'এখনকার লোক আর একেলে জিনিস নিয়ে খুশী হচ্ছে না, সেকেলে জিনিস চাইছে। একালের ফ্যাশানে আর মন উঠছে না তাদের, সেকালের ফ্যাশানে ফিরে যেতে চাইছে। অলঙ্কারের রাজ্যে দেখছেন না কি? আমার বৌ কী সব গয়না বাজার ঢুঁড়ে কিনে এনেছেন? সবার বৌই তাই। সেকালের হাঁসুলি বাউটি বাজুবন্ধ আবার তাঁদের এখন নয়া পছন্দ!! বলছি কি তবে? মাথার সিঁথিময়ূর থেকে পায়ের চপ্পল পর্যন্ত আপাদমস্তক পরিবর্তন!'

'তাই নাকি?'

'তবে আর বলছি কী? সেইমত এখন বাসন-কোশন বসন-ভুষণ, আসন-আসবাব প্রভৃতি সবকিছুতেই সেকালকে ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে আর একালের লোকের মন উঠবে না। বুঝেচেন মশাই?'

'আপনার এমন সব ফার্ণিচারে আরাম পাচ্ছে না তারা? এই আরামের রাজত্ব ফেলে.......'

'রামরাজত্বের আমলে ফিরে যেতে চাইছে তারা। সেই রকম খাট পালঙ্ক সব বানাতে হবে আমাদের এখন। তাই ভাবছিলাম.......'

'ভাবনার কথাই বটে।' আমি মাথা নাড়ি।

'আচ্ছা, রামকে বনে পাঠাবার জন্যে রাজা দশরথের সঙ্গে ঝগড়া করে দুয়োরানী কৈকেয়ী যে পালঙ্ক ফেলে ভুঁয়ের ওপর শুয়েছিলেন সেই পালঙ্কের নক্সাটা ছিল কেমন বলতে পারেন?'

'না। তবে ভুয়ের নক্সাটা বাতলাতে পারি। এখনকার মত এই রকমই মাটি হবে।' আমি ভুয়োদর্শীর মতই কই।

'সেই পালঙ্কটার নক্সা আমি চাই। পেলে পরে বাজারে চালাই এখন।' তিনি সোৎসোহে কন : 'বাজার মাত করে দিই তাহলে।'

'কোথায় পাব সে নক্সা?'

'রামায়ণ মহাভারতের কোথাও? কোনো পুরাণেফুরাণে? নেই কোনো খানে?'

'খট্টাঙ্গ-পুরাণ বলে কেনো পুঁথি আছে কি না জানি না। থাকলে তাতেই থাকা সম্ভব।

নয় তো অজন্তায়। সেইখানেই যেতে হবে আপনাকে!'

'আপনার মতন এমন সবজান্তা থাকতে আমি অজান্তার কাছে যাব কেন? সে কী জানে! সে কী জানাবে আমাকে!'

'আহা, সে অজান্তা লোক কেন হবে গো! অজন্তা শোনেননি? অজন্তা গুহা। সেখানকার গিরিগাত্রে গুহার গর্ভে সেকালের ছবি-টবি খোদাই করা আঁকা হয়ে রয়েছে, তাই থেকে আপনার মনের মতন আসবাব পত্রের নক্সাও আপনি পেতে পারবেন। অজন্তা, ইলোরা, মহেঞ্জোদোরো, হরপ্পায় পাবেন এসব।'

'কেন, এই কলকাতায় বসে পাওয়া যায় না?'

'পেতে পারেন হয়ত। তাহলে আপনাকে যেতে হবে আমাদের জাতীয় পাঠাগারে। ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে। সেখানে যদি ঐ সব জায়গার নক্সা টক্সার প্রতিলিপি থেকে থাকে কিম্বা ও সবের বর্ণনা দেওয়া কোনো পুরানো বইপত্র। থাকলে ওখানেই থাকবে। পাওয়া যাবে ঐখানেই।'

'তা হলে ওখানেই যাওয়া যাক। জায়গাটা কোথায়?'

'আপনার এই চেতলার বাড়ির থেকে বেশীদূর না। যে তেত্রিশের বাস ধরে আপনার এখানে এলাম, সেই পথের ওপরেই পড়ে জায়গাটা।......

'বটে? বটে? চলুন চলুন! শুভস্য শীঘ্রম্।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়েছেন।

তারপর ট্যাক্সি চেপে চকিতের মধ্যে আমরা তাঁর চেতলার কারখানার থেকে সেই লাইব্রেরী কাণ্ডে গিয়ে পড়েছি। কাঠের রাজ্য থেকে যতো আকাঠের রাজ্যে।

সেখানে গিয়ে সৌভাগ্যই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক গবেষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম—কথার সঙ্গে হর্ষবর্ধনকেও—'ইনি আমার এক বন্ধু, কাঠের কারবারী। আমাদের জাতীয় আসবাবপত্রের পুরাতত্ত্ব জানতে উদ্গ্রীব।'

'আসাবাবপত্রের পুরাতত্ত্ব? কিন্তু তার সম্পূর্ণ খবর কে রাখে?'

'পুরাতত্ত্ব মানে পুরাবৃত্ত? ফ্যাশনচক্র তো একই বৃত্তে ঘোরে ফেরে বারবার দেখা গেছে নাকি। সেকালের পোষাক আশাক যেমন একালে ফিরে আসছে—সেই বাবরি চুল, সেই জুল্‌পি দেওয়া গালপাট্টা—দ্যাখোনি?.....

'এমনকি গয়না টয়নার ব্যাপারেও সেযুগের মামুলি অলঙ্কার সব ফ্যাশান হচ্ছে এখন। সেই হাঁসুলি, বিছে, তাগা, অনন্ত, বাঁউটি, বাজু ইত্যাদি ইত্যাদি—যেমনটা ফিরে আসছেনা ফের!' হর্ষবর্ধন কন।

'বৃত্তটা সম্পূর্ণ ঘুরে এসেছে এতাবৎ। আসবাবপত্রের বেলাতেও সেই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—বৃত্ত পুরা হয়েছে। সেই পুরাবৃত্ত—তার বৃত্তান্তেরই খোঁজখবর চান ইনি। কোথায়—কোন বইয়ে তা পেতে পারেন জানতে চান তাই।' আমি জানাই।

'আসবাবপত্রের ফ্যাশনে আমি আবার রামরাজ্যের আমদানি করতে চাই মশাই!'

'ও এই!' শুনেই তিনি লাইব্রেরিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্তরের হদিশ বাতলে দিলেন। তারপরে সে সব হাতে এলে, কোথায় যে মেলে দেখিয়ে দিলেন তাও—'এই পাতাকটাতেই আপনার জানবার যা কিছু পেয়ে যাবেন।'

পাতা কটার ওপর চোখ বুলিয়ে সায় দিলেন হর্ষবর্ধন—'হ্যাঁ, এই হলেই হবে। আপাতত এই যথেষ্ট। তা, কত টাকা দিতে হবে বইটার জন্য আপনাদের? দুশো? পাঁচশো?

দু-হাজার?' লাইব্রেরিয়ানকে তিনি শুধান।

'বই তো আমরা বেচব না। এমন কি দশ হাজার টাকা জমা রেখেও ছাড়তে পারব না এসব বই। রেয়ার বুক্‌স-পর্যায়ের কিনা এসব। তবে এখানে এসে পড়তে পারেন—কপি করে নিয়ে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে। এই কটা পাতাই তো? কেউ বসে কপি করলে ঘন্টাখানেকের মামলা। কিন্তু দোহাই, শর্টকাটে যাবেন না যেন। খবরদার।'

শর্টকাটের মানে বুঝতে চান হর্ষবর্ধন।

'মানে, ব্লেড দিয়ে পাতা কটা কুচ করে কেটে নেবার কু-মতলব ভাঁজবেন না। তা হলেই থানায় যেতে হবে বুঝেছেন?'

'সেখান থেকে সোজা শ্রীঘর। সেটাও আবার এই আলিপুরেই।' আমি খোলসা করে বুঝিয়ে দিই— 'এইসা কুচ্‌-কামকা বাস্তে এহি হোতা হায়!' রাষ্ট্রভাষায় বক্তব্যটা রাষ্ট্র করি তার ওপর।

রাষ্ট্র করার পর আমার রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রকাশ পায় সাদা বাংলায়—'সত্যি বলতে এই সব কপি করতে আমরা উৎসাহ পাই না—যাঁদের নাম বহনের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের একজন অবশ্যি সেই ত্রেতা যুগে কপিদের নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু একালে আজ আমার পক্ষে ওই কপিকল হওয়ার সাধ্য একেবারেই নেই।'

'মানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি মশাই?' তিনি আমায় উদ্দীপনা দিতে চান—'বেশ আপনার একটা গল্প লেখার পরিশ্রমিক যদি আপনাকে দিই? আপনার একটা লেখার দাম কতো? এক ঘন্টায় আপনি কত রোজগার করেন বলুন তাহলে?'



'তাহলে?' আমি ভাবতে লাগি। ভেবে দেখি সে কথা কইবার নয়। ঘণ্টাখানেক রিক্সা টানলে যতো রোজগার হয় কলম টেনে আমার উপায় তার চেয়ে ঢের ঢের কম। আমার পাড়ার একটা ঠেলাওয়ালা এক বেলা ঠেলা ঠেলে যা কামাই করে একাধিক সম্পাদককে ঠেলা ঠেলি করেও তার সিকির সিকি আমি দেখতে পাই না।

আমাকে ভাবান্বিত দেখে হর্ষ কন—'আপনার ঘন্টামজুরীর হিসেব থাক। আপনাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। তার চেয়ে আমার হিসেবেই আপনাকে দিই না হয়। এক ঘন্টায় আমার নিজের যা আয় হয় তাই থেকেই হিসেবটা বার করা যাক। মিনিটে মিনিটে কত হয় তার চুলচেরা খতিয়ানে না গিয়ে ঘন্টায় মোটামুটি হাজার খানেক—খুব না বেচা কেনার দিনেও হয়ে থাকে, আমার ধারণা। সেই হারেই দিই না কেন আপনাকে? এই টুকু কপি করার জন্য হাজার খানেক খুব বেশী নয় বিবেচনা করে দেখলে। তবে সাধারণ জ্ঞানে এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক এক হাজারই ঠিক, তার কম নেওয়া যায় না, দেওয়া যায় না কাউকে।' বিবেচনা পূর্বক তিনি কন—'কেন, ভেবে দেখুন, আপনি রাজী কিনা।'

না ভেবে চিন্তেও নারাজ হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলি—'হ্যাঁ, রাজী। তবে ঘন্টাখানেকের ভেতর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। সময় লাগবে। রয়ে বসে ধীরে সুস্থে এই কটা পাতা কব্জা করতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে আমার। বিকেল গড়িয়ে যাবে বোধ হচ্ছে। তবে সময় যাই লাগুক, আপনাকে ওর বেশী টাকা লাগাতে হবে না আর। ওই এক হাজারই আমার যথেষ্ট।'

'তা য-ঘণ্টা লাগে লাগুক। আমি আমার কারখানায় গেলুম। সন্ধ্যে বেলায় এসে নেব খন। এই ধরুন আপনার দক্ষিণার এক হাজার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত বাড়াই। হাজারে ব্যাজার আমি কক্ষণো নই। উনি পকেটের থেকে খান দশেক বড় নোট বার করে দিয়ে গেলেন।

আর তিনি উধাও হবার পরই আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগলুম। সেই গবেষক বন্ধুটিকে গিয়ে ধরলুম—'ভাই, এই পাতা কটা তুমি কপি করে দেবে আমায়? তার জন্যে পাঁচশো টাকা দেব আমি।' তারপরে মৌনতার সুযোগ নিয়ে পাঁচশো টাকা তাঁর হাতে ধরে দিই।

তিনিও মুখ বুজে নিয়ে নেন। কোনো উচ্চ বাচ্য না করেই।

আর, তার পরেই, আমার চোখের ওপরেই সেখানে পাঠরত তাঁর কলেজের এক ছাত্রকে ডেকে বলেন—'বাঁপু, এই পাতা কটা কপি করে দাও তো চটপট। ধরো এই দুশো টাকা।'

আমি পাঁচশো আর তিনি, তিনি তিনশ নগদ পকোটস্থ করে বেরুবার মুখেই দেখতে পেলাম ছেলেটি শিশু বিভাগের পড়ুয়া বালখিল্যদের ভেতর থেকে একজনকে পাকড়ে এনেছে আর তার হাতে একশ টাকার একখানা গছিয়ে দিয়ে কী যেন বলছে.........।

কী বলছে তা বুঝতে আমাদের বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের মুখে এলেন হর্ষবর্ধন। এসেই তাঁর কপিটা পেলেন। লাইব্রেরির এক বেয়ারার হাত থেকে। সে তাই নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

তাই পেয়েই হর্ষবর্ধন কী হর্ষোৎফুল্ল!

—'বাঃ, বেশ হয়েছে। দিব্যি কপি। গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দেওয়া—হস্তলিপি শেখার বইয়ে যেমনটা থাকে। স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। পড়ে বোঝার কোনো অসুবিধা হবে না আমার।'

'হ্যাঁ বাবু!' আপ্যায়িত হাসি হাসে বেয়ারা।

বেচারার হাসিটা একটু বেয়াড়া ঠেকলেও হর্ষবর্ধন কিছু কম আপ্যায়িত নন—'এতক্ষণ তুমি এই নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিলে আমার জন্যে? তোমাকেও কিছু দিই, কেমন? টিফিন করোগে।

তাঁর মনিব্যাগ উন্মুখ করার মুখেই বেয়ারাটা ব্যগ্রভাবে বাধা দেয়—আবার কেন দিবেন বাবু? আমার মেহনতি তো পেয়েই গেছি। এই টুকুন লিখার কাম, এর জন্য দশ টাকাই তো বহুৎ। দুটাকার কামে দশ টাকা মজুরি! বহুৎ বহুৎ! আর আমার চাই না বাবু!'

উন্মুক্ত ব্যাগের উন্মুখ একশ টাকা হাতে ধরে হর্ষবর্ধন হতভম্ব হন! টাকা দিতে গিয়ে এই প্রথম তাঁকে অপারগ হতে হয়। অর্থনির্লোভ এ রকম বোকা লোক আছে নাকি কোথাও!



হর্ষবর্ধন হলেন পদ্মরাবণ

হর্ষবর্ধন কথাটা যেন মুখে করেই বসেছিলেন!

'সরবোনাশ হয়েছে!' আমাকে দেখবামাত্রই উদ্গারটা বার হলো তাঁর। শুনে আমারই যেন সর্বনাশ হয়ে গেল। ওঁর ওই এক ঢেকুরেই আমি যেন কুঁকড়ে গেলাম।

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। যে টাকাটা ধার চাইবার আশা করে এসেছিলাম, তার আদ্ধেকটা ছাড় দিতে হল গোড়াতেই। অর্ধাংশে কতটা দাঁড়ায়, কত দিক সামলাতে পারবো, মনে মনেই তার হিসেব কষলাম তক্ষুনি। কতটা ক্ষতি হোলো খতিয়ে দেখতে হোলো আমায়।

তারপরে সায় দিলুম তাঁর কথায়—'কিসের সর্বনাশ?'

'বলবেন না আর! কলকাতার কোথায় নাকি কী মেলা হচ্ছে, দেশের আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়েছেন তার। দল বেঁধে দেখতে আসছেন সব্বাই। কোথায় আর উঠবেন? আমার বাসাতেই পায়ের ধুলো দেবেন বলে জানিয়েছেন দয়া করে। এবং আর বিলম্ব নেই, কাল অতি প্রত্যুষেই সদলবলে এসে পড়ছেন তাঁরা।'

'তাই নাকি?' শুনে আমিও আঁতকাই, 'বলেন কি! সর্বনাশই বটে।'

'গান্ধীজী তো বলেন সর্বোদয়ের কথা? নাকি, বিনোবা ভাবেই বলে থাকেন এ কথা?' হর্ষবর্ধন কন: 'তা যিনিই বলে থাকুন কথাটা একই। এ ভাবে সবার উদয় একসঙ্গে হলে কারুর না কারুর দারুণ সর্বনাশ না হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে সর্বনাশটা দেখা যাচ্ছে আমারই।'

'খুব নিকট সম্পর্কের আত্মীয়জন নাকি?' জানতে চাই।

'আরে না না', মুখখানাকে যার পর নাই ব্যাজার করার পর তিনি উজাড় করেন: 'নিকট সম্পর্কের আত্মীয় তো আমার একটাই, সে নিকটেই থাকে। ঐ গোবরা। এরা সব দূর দূর সম্পর্কের। দূরাত্মীয় বলা যায়।'

'তাহলে দুরাত্মাই বলা উচিত সোজাসুজি। দুরাত্মা মানেই নাছাড়। ছারপোকাই এদের দাবাই। এন্তার ছারপোকা পুষে রাখতে হয় বিছানায়—এক রাত্তিরও পোহায় না—দুরাত্মীয় যত বাপ বাপ বলে পালায়—সুদূর পরাহত হয়ে সুদূরাত্মীয় হয়ে যায় চিরদিনের মতই।'

'জানি জানি। আপনার গল্প পড়েই জানা আছে আমার, কিন্তু এক আধজন হলে সে কথা ছিল। এ যে দলকে দল মশাই! তাছাড়া আমার ঘরে ছারপোকা কোথায়! টেন্ডার

দিয়ে যে লাখ লাখ ছারপোকা আমদানি করব তারও সময় নেই। এসে পড়ল বলে। দয়া করে, আজে বাজে কথা ছেড়ে, বাঁচবার একটা উপায় বাতলান!' তিনি কাত্‌রান।

'বাবা বলতেন জ্বর আর পর খেতে না পেলেই পালায়।' আমি বলি—'আপনজন খেতে না দিলেও পড়ে থাকে, ছেড়ে যায় না। কিন্তু পর ভোগরাগে বঞ্চিত হলে, তক্ষুণি পরাৎপর হয়ে যায়..........'

'পরাৎপর? পরাৎপর তো নারায়ণের নাম, তাই না?'

'নারায়ণই বটে। অতিথিও তো নারায়ণ। তাকে যথোচিত ভোগ নিবেদন না করলে তিনি যে যথার্থই তাই, হাতে হাতে তার প্রমাণ মিলে যায়। নারায়ণের ন্যায় তিনিও অন্তর্হিত হন—অদৃশ্য হয়ে যান বেমালুম।'

'না মশাই, সেটি আমি পারব না। যতই দুরাত্মা হোক না, উপোষ করিয়ে রাখতে



পারব না কাউকে। হাজার পর হলেও।'

'না না। খাওয়াবেন বই কি? নানা রকমেই খাওয়াবেন, তবে ওরই মধ্যে একটু রকমফের করে—এই আর কি!'

'কি রকম?'

'রসগোল্লা রাজভোগই তাদের পাতে দেবেন, শুধু কেবল তার ভেতর কুইনিন্ মিশিয়ে..........।'

'রাজভোগের ভেতর কুইনিন্! সে আবার কি মশাই!'

'এক দুর্ভোগ। আবার কী? রাজভোগ হল গে রাজার খাদ্য........।'

'জানি জানি। রাজা মানে কিং, কে না জানে?'

'জানেন তো! সেই কিং-এর মধ্যে যদি কুইন গিয়ে সেঁধোয়—কুইন ইন্ করে, কুইনিন

হয় যদি—কী হয় তাহলে?

'রাজভোগের গর্ভে রাণীযোগ—হলে যে কি হয় তা আমার ধারণাই হয় না।' তিনি জানান—'ভারী বিসদৃশ একটা কিছু হয়ে যায় বোধ হয়?'

'বিসদৃশ তো বটেই, এমন কি, বিষের সদৃশই প্রায়। কিন্তু এ বিষ সে বিষ নয় মশাই! মারাত্মক বিষ নয়, প্রতিষেধক বিষ। বিষস্য বিষম্ ঔষধম্—বলে না? সেই রকমের এক বিষম চিকিৎসা! বসন্তের টীকা যেমনটা। সে তো বসন্তের বীজাণুই—গায়ে পড়ে নিয়ে আসা হয় না? কিন্তু সেই বীজ আসল বসন্তকে আটকায়, হটিয়ে দেয়. হতে দেয় না। আত্মীয় কুটুমরা তো বিষতুল্যই বটে। কিন্তু আমার এই বিষ চিকিৎসায় তাদের নির্বিষ করে ছেড়ে দেয়—তাদের বিষাক্ত কামড় বসাতে পারে না আর। ছোবল মারার জো পাবার আগেই কুলোপানা চক্কর দেখিয়েই কেটে পড়ে। ভাগলপুর চলে যায় সটান্!'

'তাই নাকি চক্করবরতি মশাই!'..........কিন্তু কুইনিন দেখে তারা খাবে কেন?'

'দেখলে কি খায় কখনো? ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াতে হবে। ছেলেদের কুইনিন খাওয়ায় যেমন করে। তাদের সামনে রসগোল্লা রেখে—লোভ দেখিয়ে। এখানে তেমনি রাজভোগের ভেতর কুইনিন ঢেকে খাওয়াতে হবে, বুঝেছেন? ব্যাপারটা?'

'কেমন হবে খেতে কে জানে!' তিনি কন।

'নেহাৎ মন্দ হবে না। কিং আর কুইনের রাজযোটক কি খারাপ হতে পারে কখনো?'

'তা হলেও খেতে কেমন লাগে কে জানে!'

'গালে চড় খেয়েছেন কখনো? চপেটাঘাত?'

'চপকাটলেট বলছেন! কেন খাব না?' অনেক খেয়েছি.....চিকেনের, চিংড়ির........তবে মশাই, এটাও বলব আলুর চপের মতন আর হয় না!'

'চপ নয়, চপেটা। দু-চার আনা দামের নয়, এই রকম—' হাতের পাঞ্জা প্রসারিত করে দেখাই: 'বিরাশি শিকের একখানা? খেয়েছেন কখনো?'

'আজ্ঞে না। তবে খেতে কি রকমটা হবে তা আন্দাজ করা যায়।'

'যায় তো? এটাও প্রায় সেই রকমই। তবে গালের ওপরে নয়, গালের ভেতরেই।.......যার-পর-নাই এই থাপ্পড় বাইরে নয়, মুখের ভেতরেই মুখস্থ করবার।'

'খাবে কিনা সন্দেহ!' তাঁর সংশয় যায় না—'আমার কুটুম্বদের পরিচয় তো পাননি আপনি!'

'ফলেন পরিচীয়তে।' আমার শেষ কথাটা বলে দিই—'আমার ওপর আপনার অতিথি সৎকারের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিন। বিধিমতই তাঁদের অতিথ্যের ব্যবস্থা হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন। ভূরিভোজে তাঁদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখব না।'

'কত খরচা পড়বে এ বাবদ?'

'ধরুন হাজারখানেক। জনাদশেক যদি আসে—মাথা পিছু একশ টাকা। আর তার বেশী হলে........'

'মোটমাট ধরুন দু হাজার। এই ধরুন......' কুড়িখানা একশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন—'এর ওপর যদি আরও কিছু লাগে তাও আপনাকে দেব। আর এর থেকে যদি কিছু বেঁচে যায়, বাঁচেই যদি, ফেরৎ দিতে হবে না আপনাকে।'

'ব্যাস্! ব্যাস্! ওতেই হবে! নারায়ণের ইচ্ছা হলে কি না হয়!'

কথাটা মিথ্যে নয়, বাস্তবিক! তাঁর আগামী অতিথি নারায়ণদের আবির্ভাবে, যা চাইতে এসেছিলাম না চাইতেই মিলে গেল তাই। তার চেয়ে বেশীই বরং। আমায় আর কষ্ট করে ধার চাইবার হেতু হাত পাততে হোলো না—এমনিতেই উদ্ধারলাভ করলুম!

এক দাবাইখানা থেকে শতখানেক কুইনিন পিল কিনে পাড়ার এক চেনা মেঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'ভাই, আমাকে স্পেশাল রাজভোগ বানিয়ে দিতে হবে একশটাক। আজ রাত্তিরেই চাই।'

'এক ছটাক? ইস্পেশ্যাল রাজভোগ? ইস্পেশ্যাল তো মশাই বানাতে হলে অন্ততঃ আধপো করে ছানা লাগবে প্রত্যেকটায়—ওজনে দু-ছটাকের কম হবে না কোনটাই। তবে না গিয়ে ইস্পেশ্যাল!'

'বেশ তাই হোক! একেকটা ওজনে একপো হলেও কোনো দুঃখ নেই, ভোজনের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। বেশ তাই আমার একশটাক.......মানে, ওজনের একছটাক না—একশখানা—মানে, মোটমাট পঁচিশ গন্ডা চাই আমার।'

'পঁচিশ গন্ডা রাজভোগ? একপোর একেকটা? আধমনের ওপর! কে খাবে মশাই



এই রকম পঁচিশ গন্ডার রাজভোগ?'

'গন্ডার ভোজনে যাবে।.......তাতো হোলো, রাজভোগের মধ্যে কি যেন দাও না তোমরা? গুলতি মতন পাওয়া যায় তার ভেতর! খেতে কিন্তু বেশ!'

'ওগুলো ক্ষীরের পুর মশাই! রাজভোগের ভেতর দেওয়া থাকে।'

'তা দিতে হবে না, এই নাও। তার বদলে আমার এই পিলের পুর দিও। বুঝেছ?'

'এগুলি কী?'

'হজমিগুলি। একপো ছানা খাবার সঙ্গেই হজম হয়ে যাবে। তা না হলে পারবে কেন খেতে? অতিথি সজ্জনদের তো খাইয়ে খুন করতে চাইনে আমরা। তাদের পেটের গোলমাল হয় তাও আমাদের কাম্য নয়। সেই জন্য আহার আর ওষুধ একাধারে এই ব্যবস্থা।'

'বাঃ বাঃ! বেশ বেশ! পরে কিন্তু এই দাবাইটা বাতলে দিতে হবে দয়া করে। এই ইস্‌পেশ্যাল রাজভোগ আমাদের দোকান থেকে বাজারে ছাড়া হবে তার পর—বুঝেছেন? এইটে চালু করে বাজার মাত করে দেব আমরা।'

'পরের কথা পরে—এখন এটা তো বানিয়ে দাও আগে চটপট্। এই নাও দশ টাকার বায়না, ধরো এখন। বাকী দাম তোমার মাল ডেলিভারির সাথে সাথেই........'

রাজভোগের অর্ডার দিয়ে পকেটে দশ কম দু-হাজার টাকা নিয়ে নিজের বাসায় ফিরে রাজার মতন দরাজ হয়ে পড়েছি, এমন সময় গোবর্ধনচন্দর এসে হাজির!

'কি ভায়া? খবর কি ফের?'

'দাদা পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে—কেনা কাটায় আপনার সাহায্য করবার জন্যে.........'

'বেশ! বেশ! রাজভোগের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাকী রয়েছে মাছ মাংস, আনাজপাতি, ডিম টিম, ঘি ফি আলু ফালু, পটল ফটল, দই টই.........' আমি কই।

'চলুন তবে রওনা হই। কোন বাজারে যেতে চান বলুন!'

'নিমতলা ঘাটের কাছে টাছে কোনো বাজার আছে? এসব মাল সেইখানে বা তার কাছাকাছি মিলবার। খুঁজে পেতে দেখতে হবে।'

'নিমতলা! নিমতলা কেন?' নাম শুনেই গোবরা চমকায়ঃ 'কেন, আর কি কোনো বাজার ছিল না কলকাতায়?'

'অতিথি সৎকারের ব্যাপার না? আর ওই সব সৎকারকর্ম উক্ত এলাকাতেই হয়ে থাকে।'

খুঁজে খুঁজে যাই—যেতে যেতে খোঁজ নিই। পোস্তার বাজার পার হয়ে গেলাম। এধার সেধার ঢুঁ মেরে দেখলাম—না, মনের মতন জিনিসটি মেলা সুলভ নয়, এমনকি এই কলকাতাতেও।

অবশেষে নিমতলার কাছাকাছি এক পথ-হাটে ঠিক বস্তুটি মিলল। রাস্তার ধারে এক জেলে বসে ছিল ইলিশ মাছের চুপড়ি নিয়ে। সে বললে, 'গঙ্গার ইলিশ বাবু! সকাল বেলায় ধরা। টাটকা ইলিশ!'

'কদ্দিনের টাটকা?'

'কদ্দিনের টাটকা? এ কী কথা কইছেন বাবু?' আমার প্রশ্নে সে যেন বিস্ময় বোধ করে। অপমানিত হয়।

'মানে, তোমার টাট্‌কা ইলিশের থেকে এমন পচা গন্ধ বার হচ্ছে না!' ব্যাখ্যা করে দেয় গোবরাই—'নাকে বালিশ চেপেও আটকানো যাবে কিনা সন্দেহ।'

'তাহোক তাহোক!' আমি বলি—'পচা ইলিশই চাই আমাদের। পাঁচ দিনের পচা হয় তো ভাল, সাত দিনের হলেও ক্ষতি নেই, দশ দিনের বাসি হলে তো আরও খাসা, পনের দিনের পচা পেলে তো লুফে নেব ভাই! সেইরকম জিনিসটাই আমার চাই।—এক বিশেষ জরুরি দরকার। দাবাই বানাতে লাগবে।'

'ও! তাহলে এটা নিতে পারেন। এক মাসের পচা মাছও দিতে পারব, বাড়ি থেকে আনাতে হবে তাহলে। তাতে এখন রং লাগাচ্ছে বৌ-ঝিরা। তার দাম একটু বেশি পড়বে বাবু! ওই মেহনতির জন্যেই বাড়তি মজুরি।'

'বেশ, এই নাও পঞ্চাশ টাকা। এই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে কাল সকালে......পাঁচ দিনের পচা হলে সের পাচেক......পাচ সেরই যথেষ্ট। আর মাসখানেকের যদি হয়তো তার দাম আরো বেশিই দেব। দশ সের দিয়ো তাহলে।'

'এখন পচা মাংস মেলে কোথায়?' তার কাছেই জানতে চাই।

'সে কোলকাতার কোথ্থাও পাবেন না। মুন্সিপালির কসাইখানার থেকে কাটা হয়ে ছাপ-মারা হয়ে রোজকার রোজ আসে বাজারে। পড়তেই পায় না বলতে গেলে, বাসি মাংসই মেলেনা তো পচা! কোথায় পাবেন! তবে নিমতলার ঘাটে গিয়ে খোঁজ নেন্.......কোথাও কোনো কুকুর বেড়াল যদি মরে টরে পচে পড়ে থাকে!'

'তাহলে পচা মাংস মাথায় থাক। পচা ডিম হলেই চলবে।'

'সব বাজারেই তা মিলবে। ঢাঁই করা চালানি ডিম সব সেখানে পড়ে পড়ে পচছে—মাসের পর মাস! যতো খুশি চান!'

ব্যস্! পাঁচ ডজন পচা ডিম কেনার পর, তারপরে ঐ জাতীয় পচা আলু পেঁয়াজ তরিতরকারী আনাজ ইত্যাদি—দোকানীদের গিয়ে বলতেই তারা সাগ্রহে নিজেরাই গাদার থেকে খুঁজে পেতে বেছে বেছে গছিয়ে দিতে লাগল।

বাকী রইল দই! টোকো পচা দই পাচার করতে ওস্তাদ এমন এক গয়লাকে গিয়ে ধরলাম, তার সঙ্গে বহুৎ দর-কষাকষির পর—টাটকার চেয়ে পচার দর বেশী কিনা, পচতে সময় লাগে তো? সেই সময়ের দাম কে দেয়?

সে যা চাইল তাতেই রাজি হয়ে, তাকে বায়নার টাকাটা আগাম দিয়ে, মাল পৌঁছনোর ঠিকানা বাতলে বাজার পর্ব সেরে সগর্বে আমরা ফিরলাম।

পরদিন সকালে হর্ষবর্ধনদের আস্তানায় গিয়ে দেখি অতিথিনারায়ণরা সবাই এসে মজুত হয়েছেন সকালে। গুণে গেঁথে দেখলাম আড়াই ডজনের কম নয়।

রাজভোগরাও এসে পড়লো খানিক পরেই। রসগোল্লার সেই রাজোচিত চেহারা দেখে অতিথিরা তো হাঁ! হাঁ হাঁ করে পড়লেন সবাই—'এগুলো আবার কি খাবার ভায়া হে? রসগোল্লার বাবা বলে বোধ হচ্ছে যেন।'

'ঐ—রসগোল্লাই।' বলে দেয় গোবরাই। 'রসে পড়ে মজে গিয়ে ঢোল হয়ে চেহারা ধরেছে।'

'রসগোল্লা। এমন ঢাউস ঢাউস চেহারা—বাপের জন্মে চোখে দেখিনি........রসগোল্লার বাবা কেন, বৃদ্ধ পিতামহই বলা যায়।'

'চোখে দেখুন এবার। সামনেই রয়েছে। রসেবশে টইটম্বুর হয়ে আছে। আপনাদের জন্যেই অর্ডার দিয়ে আনানো—বিশেষ তরিবতে বানানো।' মেঠাইওয়ালা জানায়।

'আমাদের জন্যে? বটে বটে! এই সব অতিকায় রসগোল্লা—আমাদের অতিথি সৎকারের জন্যেই? হর্ষবর্ধন ভায়া, কি বলব আর তোমায়।........'

'রাজভোগের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?' আমি কইঃ'এগুলি তার বাবা—মহারাজ ভোগ!'

'কিম্বা তার ঠাকুরদা! সম্রাটভোগ।' গোবর্ধন আওড়ায়ঃ—'এখন আপনাদের সামনে ভোগ দেওয়া হোলো। বিলম্ব না করে উপভোগ করুন।'

'দয়া করে গলাধঃকরণের আজ্ঞা হয়।' গোল্লাদের হয়েই যেন হর্ষবর্ধনের উপরোধ।

বলার আগেই তাঁরা গালে তুলেছেন। তারপর তাদের মুখের চেহারা এক একখানা যা হল তা আর বলবার নয়, তাকিয়ে দেখবার।

সাপকে ছুঁচো গিলতে কখনো দেখিনি—সে সময় সাপের মুখ ঠিক ছুঁচোর মতই হয়ে যায় কিনা তাও যথার্থ জানা নেই, কিন্তু সেই দৃশ্যই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার।

'উ হুঁ হুঁ! ফেলবেন না, ফেলবেন না, গিলে ফেলুন। গিলে ফেলুন। বহুৎ দামী জিনিষ.......' সনির্বন্ধ অনুরোধ আমার—'বঢ়িয়া চীজ।'

'পড়ে রইল যে সব! আরো দুএকটা মুখে তুলুন!...... গোবরার আবেদন।

'আধখানা অন্ততঃ।' তদুপরি হর্ষবর্ধনের উপরোধ।—'না খেলে ভারী মর্মাহত হব।'

'না, থাক এখন। পরে খাওয়া যাবে'খন। ইষ্টিশনে নেমেই চা বিস্কুট খেয়েছি তো পেট ভরে।'

'পরের জন্য তো রয়েছেই।' আমি আশ্বস্ত করি—'অঢেল আছে, ফুরোচ্ছে না। ভাতের সঙ্গে খাবেন আবার। বিকেলের দিকে জলখাবারেও পাবেন আবার.........'

'অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ....... ? তাই নাকি। অ্যাঁ-অ্যাঁক-ওয়াক!' বলতে বলতে মুক্ত কচ্ছ হয়ে বাইরে ছুটলেন ভদ্রলোক।

'এই সম্রাটভোগ আছে নাকি আরো?' ওয়াক-ইন করেই উক্ত ভদ্রলোকের এই কাতরোক্তি।

'অঢেল অঢেল! তবে আর বলছি কি?' আমি জানাই।

'পাঁচ হাঁড়ি মজুদ এখানেই। আরও হাঁড়ি দশেক এসে পড়বে বিকেল নাগাদ।' মেঠাইওয়ালার বিবৃতি।



'থাক না। আমরা তো পালাছি না, মধ্যাহ্নভোজনে দেখা যাবে। যাই, ততক্ষনে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসা যাক।' বলে গাড়ু গামছা নিয়ে তাঁরা তীরবেগে বেরিয়ে পড়লেন।

চানটান শেষ করে ফিরে এসেই দেখলেন মধ্যাহ্নভোজনের আসন পিঁড়ি পড়ে গেছে। এদিকে রান্না ঘরের থেকে পচা গন্ধ বেরিয়েছে এমন!

নাক সিঁটকে পাতায় এসে বসলেন সবাই—'মাছের ঝোল দিয়ে দুটিখানি ভাত খাই। কিন্তু ভাই, তোমার ওই সম্রাটভোগ আর নয় কিন্তু।'

না বললে শুনছে কে! হর্ষবর্ধন-গিন্নি এক এক রেকাবিতে চারটে করে ঐ বিরাট ভোগ বসিয়ে পাতার ধারে ধারে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন।

গন্ধমাদন ইলিশমাছ ভাজা ঝোল ঝালরূপে বাটি বাটি এসে বসে গেল পাশাপাশি।

'ভালোই হবে মাছটা। যা সৌরভ পেলাম এখন। তবে ইলিশ আমার পেটে সয় না আবার। পেটটাও ভাল নয় তেমন.........' বলে প্রায় প্রত্যেকেই ইলিশের বাটি দিয়ে রসগোল্লার রেকাবিকে দূরে হটিয়ে দিলেন—'থাক, অনর্থক এঁটো করে নষ্ট করার কোন মানে হয় না.......।'

'কালীঘাটে মাকে দর্শন করার বাসনা ছিল। এখানেই অনেক দেরি হয়ে গেল........' একজন তো প্রায় উঠি-উঠি।

'বসুন বসুন! ভাল করে খেলেন না, এক্ষুনি যাবেন কি?' গোবরার মিনতি।

'নাহে না! আমার বেয়াইমশাই কতো করে বলে রেখেছেন, কলকাতায় এলে যেন তাঁর বাড়িতেই উঠি এবারটি।'

'বেশ ত, যাবেন এখন। তাড়া কিসের এত?' হর্ষবর্ধন কন।

'আমাকেও বোনের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতে হবে একবার। আর গেলে কি ছাড়বে তারা আমায়? আটকে রাখবে। থাকতে হবে সেখানেই.......'

'কিন্তু এত রাজভোগ মিষ্টি ফিষ্টি পড়ে রইলো সব.......।' আমার উপরোধ উপরন্তু—'দু-একটা ওই রাজভোগ না হয় মুখে তুলুন!'

'না না না!' সমবেত প্রতিবাদের ঝড় ওঠে—'আমরা সাধারণ মানুষ। রাজা গজা নই মশাই! ও খাবার আমাদের সয় না, আমাদের মুখে শোভা পায় না।'

'ওই বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন আমাদের........' হর্ষবর্ধন বিনয়ে অবনত হন।

'যা খেলাম খুব। আপনি বরং........যদি দইটই থাকে.......দই থাকলে তাই দিন একটুখানি, দই মেখে দুটি ভাত খেলে পেট ঠান্ডা হবে, হজম হয়ে যাবে। আছে দই?

'দই নেই, তার মানে?' বলতে না বলতে দই-এর বাঁক ঘাড়ে গয়লা এসে হাজির। তার ছেলেও এসেছে তার সাথে এক ঝাঁকা মাটির ভাঁড় হাতে করে।

'দাও! দাও! দই-ই দাও।' উল্লসিত হয়ে ওঠেন সবাই।

ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভর্তি করে সামনা সামনি ধরে দেওয়া হলো তাদের।

কিন্তু এক চুমুক দই মুখে তুলেই তাঁদের চক্ষুস্থির। চোখ উল্টে গেল কজনের!—'এ কি দই রে বাবা!' ডুকরে উঠেছেন জন দুয়েক—'বাপের কালেও খাইনি কখনো। কলকাতায় দইএর এমন নামডাক শুনতাম.........! এই কি সেই........?'

'হ্যাঁ, সেই চিনিপাতা সরেস দই-ই।' আমি কই।

'বস্তা পচা! রাম রাম!'

'টক জোঁদা! ছি-ছি-ছি!'

'ওয়াক্, ওয়াক ওয়া-য়া-য়া-ক!'

পাতের থেকে উঠে ওয়াক আউট করার ফুরসৎ হোলো না তাঁর, পাতের ওপরেই করে বসলেন!

এই সময়েই দইওয়ালা বাকী দামটা চেয়ে বসল।

'দাম! কিসের দাম হে?' অতিথিদের মোড়ল তো অগ্নিশর্মা—'পচা দইয়ের আবার দাম কিসের? মানুষ খুন করার জন্যে পুলিসে দেওয়া উচিত তোমাকে!'

আমি তাকে সমর্থন করি—'তোমার কি রকম আক্কেল হে গয়লার পো! এই দই কি মানুষের পাতে দেয় নাকি? এর চেয়ে বিষ দিয়ে গেলে না কেন? আফিম দিলেই পারতে! অন্ততঃ গন্ধে সেকো বিষ। কি টিক টোয়েন্টি? কিংবা ঐ ফলিডল? ধানগাছের পোকামাকড় তাড়ানো—তাও কি জোটাতে পারনি? এর চেয়ে সস্তায় কাজ সারতে তাহলে। এই মানুষ খুন করার পেশা কদ্দিন ধরেচ শুনি?'

গয়লা কিছু কয় না, মুখ বুজে থাকে।

গোবরা ক্ষেপে যায় আরো—'ঠকাবে বলে কি এমনি করেই ঠকাতে হয়? একেবারে পচা বিচ্ছিরি—জোঁদা টক—যাচ্ছেতাই দই! রাম রাম! দশ টাকা সেরের দর নিয়েছ—তার ওপর এই গলায় ছুরি!'

গয়লার পোর তবু কোন সাড়া নেই। রা কাড়ে না সে।

অতিথিরাও সবাই ছ্যা ছ্যা করতে থাকে।

গোবর্ধন অতিথি সজ্জনদের উৎসাহে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—তাঁর কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়—

'সাধে কি আর তোমাদের বলে আশী বছরে সাবালক। তোমাদের বুদ্ধি গোরুর বুদ্ধি প্রায় সমান। এক গোত্র—এক গোয়ালের তোমরা। আশী বছরের খাসী কোথাকার!

তবু গয়লা কোন উচ্চবাচ্য করে না।

'আমাদের এত বড় অতিথি সৎকারটাই মাটি করে দিল গো!' বলতে বলতে গোবরার মেজাজ চড়াং করে চড়ে উঠে বিরাশি শিক্কার চড়ে গিয়ে পর্যবসিত হয়। গয়লার গালের ওপরেই.....ধাঁ করে এইসা এক চড় বসিয়ে দেয় হঠাৎ যে বেচারা মাথা ঘুরে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ.........

কিন্তু উঠেই না সে হাতের বাঁক-কে বাঁকিয়ে ধরে—'এ কি বাবু! বকবার কথা ছিল ধমকাবার কথা ছিল কিন্তু মারবার কথা ছিল না তো! এ কি রকম কথা?'

গোবরার তখন কাণ্ডজ্ঞান ফেরে—'আরে থাম থাম, কাকে কি বলছিস! চুপ কর!' আগুনে যেন জল পড়ে তক্ষুণি।

'চুপ করব কি, আপনার সঙ্গে কী চুক্তি ছিল তাই বলুন!' চুক্তি খেলাপের হেতু বাঁক তুলে বাঁকাকেষ্টর মতই সে তেড়িয়া! এই বসায় কি সেই বসায়!

'আরে থাম্ থাম—বেমক্কা মারে তোর মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলছিস্'! হর্ষবর্ধন মাঝখানে পড়েন—'আমার ভাইয়েরও ঠিক নেই মাথার। কাকে কী বলতে হয় কইতে হয় করতে হয় কিচ্ছু জানে না। ও তোকে মারবে বলে মারেনি, কিছু মনে করিসনি লক্ষ্মীটি!'

'ধাঁ করে বাবু এক চড় বসিয়ে দিলেন, অথচ উনি নিজে—উনি আর ইনি—(আমাকে দেখিয়ে) দুজনে মিলে যা যা বলেছেন আমি ঠিক তাই তাই করেছি.........'

'আহা দামই নিবি নয়। ডবোল দামই দেব না হয়!'

'না বাবু, সে সব হবে টবে না.......। দাম আমার চাইনে। আমি এই বাঁক ওর পিঠে বসাব এক ঘা........ওঁকে এই বাঁকের মতই বাঁকিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার পরেই আমার এখান থেকে যাওয়া! আর এই সব ভালো মানুষের ছেলেদেরও (আসনে উপবিষ্ট অতিথিদের দেখিয়ে) দেখে নিতে চাই আমি—ওদের জন্যেই আমার যা হবার নয় তাই হল....আমার বদনাম হোলো.......আমার দইএর বদনাম হোলো..........'



এই বলে সে হর্ষবর্ধনের সমুদ্যত হাতের নোটের গোছার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বাঁক তুলে বক্রমুর্তি ধরে বসেছে!

অতিথিরাও পাতা ছেড়ে সব কিছু ফেলে দুদ্দার করে যে যেদিকে পারে ছুট দিয়েছে তক্ষুণি—

আর সেই বক্রমুর্তি দর্শনের পরই আমি সোজা পথ ধরেছি আমার........।

বিকেলবেলা অতিথিদের খবর নিতে গিয়ে দেখি তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট কেউ আর পড়ে নেই সেখানে।

'গোবরা ভায়াকেও দেখছি না যে।' হর্ষবর্ধনকে শুধাই।

'অনেক রাজভোগ পড়ে রইল কিনা। নষ্ট হয় কেন, তাই সে নিজের হাসপাতালেই দিতে গেছে সে সব। রুগীদের খাওয়াতেই।'

'ওর হাসপাতালে? হাসপাতাল আছে নাকি ওর?' শুনেই চমক লাগে—'নাকি, ওর নামে আপনিই একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন?'

'আমি কেন করব?—ওই যে গোবরার হাসপাতাল বলে থাকে? কে প্রতিষ্ঠা করেছে কে জানে। তবে জন্ম থেকে শুনে আসছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখেছি বটে। ঐ গোবরার হাসপাতাল। ওখানে খুব ভাল ট্রীটমেন্ট হয়ে থাকে।'

'ভালো ট্রীটমেন্ট হয়?'

'হ্যাঁ চিকিৎসাপথ্য ভালোই হবে খুব। সেরে উঠেও রুগীরা কেউ ছাড়তে চায় না নাকি হাসপাতাল। উল্টে ডাক্তারদের ধরে ট্রীটমেন্ট করে তারপর, পড়েননি কাগজে?'

বলতে বলতেই গোবরা ফিরে এল—'বলব কি দাদা, এবার বরাত খুলে গেল আমার। নাম বেরিয়ে গেল বাজারে। ঐ রসগোল্লার দৌলতেই। রুগীরা ঐ রাজভোগ খেয়েই না বাপ বাপ বলে হাসপাতালের ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়েছে সবাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রুগীরা এসে ভর্তি হয়ে গেছে বেডে বেডে। ডাক্তারবাবুরা খুব খুশী—সরকারকে তাঁরা জানাবেন কথাটা। যাতে আসছে বছরের সম্মান তালিকায় আমার নামটা ওঠে। পদ্মভূষণ না পদ্মবিভীষণ কী যেন দেবে।'

'তোকে পদ্মবিভীষণ করে দেবে? বলিস কি রে? আর আমাকে তারা কিছু করবে না?........'

ভাইয়ের ভাগ্যে হিংসে হয় দাদার—'আমি যে তোর দাদা? যে তোকে এতটুকুর থেকে এত বড় করল—এত বড় হতে দেখল, তার বরাতে কিছু নেই? তাকে কোনো খেতাব দিচ্ছে না সরকার? অ্যাঁ?'

'দরকার কি তোমার?' দাদার রাগ গোবর্ধন এক কথায় উড়িয়ে দেয়—'পদ্মবিভীষণের দাদা হয়ে তুমি তো এমনিতেই পদ্মরাবণ হবে দাদা? হবে না? সে তো আরো বড়ো খেতাব!'

'তা বটে! তা বটে!!'

ভাইয়ের কথায় দাদার একমুখ হাসি দশগুণ হয়ে প্রায় দশাননের দশায় দাঁড়ায়।



হর্ষবর্ধনের টোটকা



সেই সাতসকালে— তখনো আমি ধরাশায়ী, ধারশায়ী ঠিক না হলেও ধরণীর সঙ্গে সমান্তরালে বালিশের ধরাবাঁধার ভেতরে বিছানার ওপরেই শায়িত—শ্রীমান গোবর্ধনচন্দ্র এসে হাজির।

'এই যে গোবরা ভায়া! কি মনে করে এই সাতসকালে হঠাৎ?'

'সাতসকাল নয় এখন, সাড়ে আটসকাল।' হাতঘড়ি দেখে সে বাতলায়, 'দাদা ডেকেছেন আপনাকে। ভারী জরুরী দরকার। চলুন।'

'কি দরকার?'

'হাত ব্যথা করছে দাদার।'

'তাই নাকি?' তা পা ব্যাথাও করছে নাকি তার?'

'না, পায়ের কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত।'

'পা যখন ভালো আছে, তখন তাঁর নিজের আসতে বাধাটা কি হোলো? দেখ ভাই, আমি তো এখনো ঘুম থেকে উঠিনি, হাফ ঘুমুচ্ছি। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে এমন ক্লান্ত যে, হাঁফ ছাড়বার ফুরসৎ পাইনি এখনো। এমতাবস্থায় এই সাড়ে আটসকালে কি করে ওই চেতলায় যাই? আর কি করেই বা আমার উচ্চরক্তচাপ নিয়ে তোমাদের তেতলায় উঠি গিয়ে? এই বয়সে অমন চাপল্য কি শোভা পায় আর আমার? বলো।'

'আমি কি বলব! দাদার হাত ব্যথা করছে যে—'

শুনে শুনে আর স্থির থাকতে পারি না বিছানায়, তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠি। এক কথা সাতবার শুনতে ভালো লাগে না আমার।

'হাত ব্যথা তার আমি কি করব?' চাড় দিয়ে উঠি, উঠে গায়ে শার্ট চড়াই, বলি, 'দেখাতে হবে ডাক্তারকে।'

'দাদ বললেন যে, আপনি লেখক মানুষ, কলম চালিয়ে খান আপনি....... তাই......'

'কলম তো হাতের কী!' আমি বাধা দিয়ে কই।

'আহা, ঐ হাতেরই ব্যাপার তো! হাত নড়লে তবে কলম নড়ে। তাই দাদা বললেন যে, উনি হাতের বিষয়ে হয়ত বিশেষজ্ঞ হবেন, কোনো টোটকা দাবাই-টাবাই জানা থাকতে পারে আপনার। সেই কারণে—'

'চলো যাই।' আমি আর কথা বাড়াই না—ওদের মোটরে উঠি গিয়ে—সটান গিয়ে দাঁড়াই সেই চেতলায়।

'কি ব্যাপার?'

‘কী যে হোলো আমার এই হাতটার মশাই!’ হর্ষবর্ধন কন বিমর্ষভাবে।

‘রামডাক্তারের কাছে যান না। দেখান না তাঁকে।’

‘ও বাবা!’ শুনেই তিনি দুবার চমকান, ‘ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে? তাহলে আর আস্ত থাকবে না এই হাত—প্ল্যাস্টার বেঁধে ছেড়ে দেবেন নির্ঘাত!’

‘তাহলে চলুন, কোনো পলিক্লিনিকে যাই না হয়।’ আমি শুধাই, ‘পলিক্লিনিক জানেন তো?’

‘পলিকে জানব না? বলেন কি!’ এক গাল হাসি দেখি তাঁর, ‘আপনার নাতিকে আর জানিনে আমি? কতোবার আমার কাছে এসেছে সে। খাসা ছেলে পলি!’

‘আহা, সে পলি নয়। সেই পলি ছাড়া কি আর অন্য পলি আপনি জানেন না?’ আমি বলি।

‘জানব না কেন? মনোপলি জানি। আমাদের যেমন ঐ কাঠের কারবারের মনোপলি। একচেটে ব্যবসা যাকে বলে। একেবারে আকাঠ নই মশাই বুঝলেন?’

‘সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাই হোক পলিক্লিনিক হল যেখানে কিনা এক জায়গায় সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে, সর্বরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন যেখানে।’

‘চলুন তবে সেখানেই।’

আমরা বেরিয়ে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

নামজাদা এক পলিক্লিনিকে যাওয়া হলো। সেখানে এক জায়গাতেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক এবং দন্ত থেকে সুরু করে অনন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা।

যে কামরাটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো, সেখানে গুরু-গম্ভীর এক ডাক্তার ব্যক্তি বসে। গোড়াতেই তিনি কড়কড়ে বত্রিশটি টাকা তাঁর ফী বাজিয়ে নিলেন। তারপর হর্ষবর্ধনকে বাজাতে বসলেন।

হাতের টাকার মতন হাতের টোকায় বাজাতে লাগলেন তাঁর বুক পিঠ। টেম্পারেচার নেওয়া হল তাঁর। থার্মোমিটারের পর স্টেথিস্কোপ দিয়ে দেখা হোলো। তাঁর কথায় চোখ উলটে জিভ পালটে দেখাতে হোলো। এমনকি আলজিভটাও না দেখে তিনি ছাড়লেন না। আপাদমস্তক সমস্ত দেখে শুনে রিপোর্টের খাতায় টুকে নিয়ে তিনি বললেন, ‘ট্রাবলটা কি আপনার?’

‘ট্রাবল এই হাতে।’ হর্ষবর্ধন হাতটা দেখালেন।

ডাক্তার নাড়ি দেখার চেষ্টা করতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, ‘নাড়ির ভেতর কিছু হয়নি। নাড়িভুঁড়িতে কোনো গলদ নেই আমার। ভুঁড়িটা আমার একটু মোটা—এমনিতেই। শুধু এই হাতটা কেমন যেন ব্যথাচ্ছে আমার সকাল থেকে।’

‘হাত ব্যথা করছে? দেখি আপনার দাঁত দেখি।’

দাঁতের ওপর চোখ কেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি, না। জিজ্ঞেস করি, ‘হাতের সঙ্গে দাঁতের কি সম্পর্ক?’

‘দাঁত খারাপ থাকলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। সেই এক দোষ থেকেই হরেক উপসর্গ দেখা দেয়।’

‘চোখও পরীক্ষা করাতে হবে নাকি ওঁকে আবার?’ আমি শুধাই।

'হতেও পারে। আগে রক্তটা দিন আপনার।' বলে রক্ত নেবার সিরিঞ্জিটা বার করেন ডাক্তার।

'অ্যাঁ? রক্ত? রক্তও দিতে হবে?' আঁতকে উঠেন হর্ষবর্ধন, 'রক্তপাতও করতে হবে আবার?'

'কোনো ভয় নেই। কোনো ভয় নেই। একটুও লাগবে না আপনার। টুক করে তুলে নেব দেখবেন। টেরও পাবেন না আপনি।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু।



আপাদমস্তক সর্বাঙ্গের সব রকম পরীক্ষা করালেন হর্ষবর্ধন, বুক পেট পিঠ হাত পা দাঁত—কোনটার পরীক্ষাই বাদ গেল না তাঁর। এমনকি, তাঁর ব্লাডপ্রেসারও টের পাওয়া হলো তারপর। তাঁর ওজন এবং বিশেষ বিবরণও নিলেন ডাক্তাররা।

সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে, দেখে শুনে শ পাঁচেকের মত খসিয়ে হর্ষবর্ধন নিজের হাত ধরে বাড়ি ফিরলেন—যেমন গেছলেন ঠিক তেমনি—কাতরাতে কাতরাতে।

কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থাই হোলো না সেদিন। বড় ডাক্তারের সঙ্গে—যিনি সবার ওপরয়ালা সঙ্গে অলরাউণ্ড ফিজিসিয়ান—তাঁর সঙ্গে মুলাকাত হোলো না এমন কি!

রাস্তায় দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাদের কথা শুনে তাদের একজন বললে আর্নিকা

খেতে, ত্রিশ থেকে তিনশো শক্তি অবধি যা খুশি। আরেক জন বললে চুন হলুদ গরম করে লাগাতে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন, পথের মধ্যে উপচে-পড়া আমাদের কথা শুনে ওপর চড়াও হয়ে বলে গেলেন, 'আর কিছু নয়, আশ্চর্য মলম। আশ্চর্য জিনিস মশাই! লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম।'

এই মতদ্বৈধ নাকি মতত্রৈধের মধ্যে কোন্ ব্যবস্থাটা যে বৈধ কি করে তার আঁচ পাবো না আঁচালো থাকলে?

আমি বললাম, 'খুব বড় ডাক্তার দেখাচ্ছেন উনি। বিধিসম্মত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আমরা পক্ষপাতী। ওসব টোটকা-টুটকির কম্মো না ভাই!'

'তাহলে শুধু ডাক্তারেই শানাবে না বন্ধু! শেষ পর্যন্ত সার্জনের কাছেই যেতে হবে।' একজন জানালে, 'বলছিলাম ভালো কথা, এক ডোজ আর্নিকাতেই সেরে যেতো একদিনে, ভুগতে হোতো না রোজ রোজ। শুনলে না! অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের খপ্পরে পড়েছো যখন, তখন আর দেখতে হবে না! রেহাই পাচ্ছ না সহজে খপ্ করে। তোমার ঐ হাত আওড়াবে, পাকবে ফুলবে, ফুলে ঢোল হবে। তারপর পচতে শুরু করবে। পচন ধরবার পর সার্জন এসে তোমার হাজার টাকা হাতিয়ে নেবার পর কেটে বাদ দিতে হবে হাত। অপারেশন অবশ্যি বেশ সাকসেসফুলই হবে, তা বলাই বাহুল্য! তবে তোমাকে পটল তুলতে হবে ঐ অপারেশনের টেবিলেই!'

ঐ কথা শুনেই হর্ষবর্ধনের হাতের যন্ত্রণা বেড়ে গেল সাত গুণ। অমন ব্যথাতেও একটুখানি গুমরাতেও ভুলে গেলেন তিনি। কেমন গুম হয়ে গেলেন।

'আমার পক্ষাঘাত হয়েছে!' বাড়ি ফিরে কেবল এই কথা বলেই বিছানায় তিনি কাত হয়ে পড়লেন। আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই তাঁর।

পরদিন সকালে আমরা পলিক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, রিপোর্ট টিপোর্ট রেডি। সব রকমের রিপোর্ট। ব্লাড ইউরিন ইত্যাদি যাবতীয় পরীক্ষার ফলাফল এসে গেছে। মায় এক্স-রে ফটোর কপিও!

অন্তঃপর সবার বড় সেই ডাক্তারসাহেবের কাছে যেতে হোলো। সবার আগে তাঁর টেবিলের ওপর গিয়ে একশ কুড়ি টাকা জমা রেখে জিজ্ঞাসুভাবে তটস্থ হলাম।

'দেখলাম সব।' বললেন ডাক্তারসাহেব, 'কিছুই হয়নি আপনার। খানিকক্ষণ গরম জলে হাত ডুবিয়ে রাখুন গে কব্জি অব্দি, তাহলেই সেরে যাবে মনে হয়।'

'ব্যথা না হয় সারলো। কিন্তু ফোস্কা?' হর্ষবর্ধন ওস্কান।

'কিসের ফোস্কা?' ফোঁস করে ওঠেন ডাক্তারসাহেব। তাঁকে একটু অবাক দেখা যায় যেন!

'গরম জলে হাত ডোবালে পুড়ে যাবে না?' ফাঁস করেন হর্ষবর্ধন, হাঁসফাঁস করতে করতে।

'আহা, সহনীয় গরম। অসহনীয় বলেছি কি?'

বাসায় ফিরে এসে এক বালতি সহনীয় গরম জলে হাত ডুবুতেই সারা হাত ঝনঝন করে উঠল তাঁর। ব্যথা বেড়ে গেল যেন বিশগুণ। আর্তনাদ ছাড়তে লাগলেন তিনি।

বাসার ঝি বলল, 'ঠাণ্ডা জল ঢালুন বাবু, এক্ষুণি আপনার বেদনা ছেড়ে যাবে চট করে।'

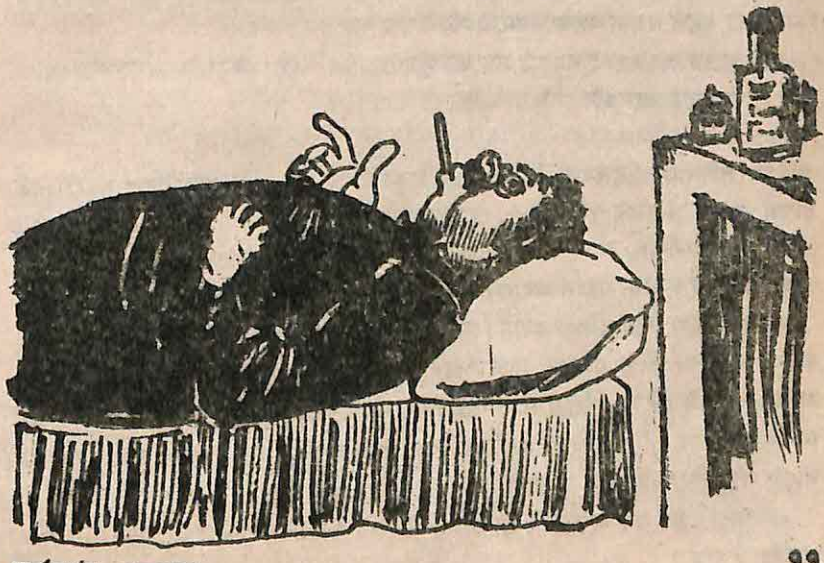
ঠাণ্ডা জল ঢালতেই, কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে গেল ব্যথাটা। কোথায় যে পালালো তার কোনো পাত্তাই রইল না।

সেই হাতেই টেলিফোন তুলে জানালেন তিনি ডাক্তারকে, 'মশাই, আপনি যে বললেন গরম জলে হাত ডুবুতে, তাই না করে আমার ব্যথা আরো ঢের বেড়ে গেল তক্ষুণি। তারপর আমাদের বাসার ঝিয়ের কথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতেই সেটা কমে গেছে।'

'যাক, ঠাণ্ডা হয়েছে কি? তাহলেই হোলো।'

'কিন্তু মশাই', সহজে ছাড়েন না হর্ষবর্ধন, 'আমি যে আপনাকে অতগুলো টাকা গুণে দিলাম সে কি এই জন্যে? যদি আমাদের ঝিয়ের টোটকাতেই আরাম হবে তাহলে—'

'সেই কথাই আমিও ভাবছি।' ভাবিত কণ্ঠের জবাব শোনা গেল ডাক্তারের, 'আমার চাকরটা কিন্তু বলেছিলো গরম জলের কথাই।'



সম্বন্ধের কথায় দমবন্ধ

হর্ষবর্ধনের কথাটা এড়ানো গেল না কিছুতেই।

কিন্তু সম্বন্ধের কথা শুনেই তো আমার দম বন্ধ হবার মতন! অবশ্যি পরে উনিও ছাড়ান পাননি—যাকে বলে টেবিল উল্টে যাওয়া। দেহরক্ষা হয় নি, তা-ই শেষ রক্ষে!

মা বলতেন, কখনো কোনো সম্বন্ধে যাবিনে, কারো সম্বন্ধে থাকবিনে, কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখবি-নে, কখনো.......

কিন্তু হর্ষবর্ধন বললেন, দেশ থেকে তাঁর কুলপুরোহিতের চিঠি এসেছে, বিশেষ করে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর বয়স্থা কন্যার একটা সৎপাত্র যোগাড় করে দিতে। তাঁদের সাত পুরুষের পুরুতবংশ, এ ভার না দিয়ে তাঁর এড়াবার উপায় নেই।

এদিকে মার কথাটাও ফেলা যায় না। ওদিকে হর্ষবর্ধনের অনুরোধও ঠেলা দায়, এক সদ্ব্রাহ্মণের কুলরক্ষা—সব দিক কি করে সামলানো যায় তাই নিয়ে ভারী ভাবনায় পড়া গেল।

জ্ঞানযোগের মোক্ষম ক্ষেত্র বিছানা—অন্তত! আমার ক্ষেত্রে। সেখানে গিয়ে পড়লাম। তিন দিন ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ভেবে ভেবে শেষটায় সর্বসাকুল্যে তিন কুলই যাতে বজায় থাকে এমন একটা উপায় বার করলাম।

কড়িকাঠের থেকে সেই আকাঠ সম্বন্ধের সুত্রপাত হল—সেখেন থেকে মাকড়সারা যেমন করে সুতো ছাড়ে অনেকটা সেই রকম ভাবেই আর কি!

হর্ষবর্ধন সেদিন বলেছিলেন—কী লিখেছেন ঠাকুর মশাই, শুনুন: 'পাত্রটি শুধু সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেই চলিবে না, ব্রাহ্মণের ন্যায় তার ষট্‌কমন্বিত হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মণোচিত কর্মবিধি, আশা করি, তোমার অবিদিত নয়। তথাপি তোমার জ্ঞাতার্থে জানাই, তাহা হইতেছে: যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ ইত্যাকার ষট্‌কর্ম—'

পত্রপাঠ বাধা দিয়ে বলি—জানি। অধ্যাপনা মানে পাড়াগাঁর পাঠশালায় পণ্ডিতের সেই ষট্‌কে পড়ানো। কিন্তু এই কলকাতা শহরে কি দেশগাঁয়ের মতন আটচালা কি পাঠশালা আছে যে সেই গেঁয়ো পণ্ডিতদের পাত্তা পাবো? এখানে ঐসব ষট্‌কে কর্ম বা ষট কর্ম চলেন না। তবে হ্যাঁ, ছেলেদের একটা ষট কর্ম আছে অবশ্যি, ইস্কুল থেকে সুযোগ পেলেই সট্‌কে পড়ে সিনেমায় চলে যাওয়া।

—আহা! ষট কর্ম না হোক, ব্রাহ্মণের কয়েকটা গুণ তো থাকা চাই অন্ততঃ। আসল বামুন তো হবে?

আসল বামুন না হোক আসলে বামুন হলেই হলো। আপনার ঐ দানফান গ্রহফ্রহ ষট কর্মের কথা তো শুনিনি কখনো, আমি তো বামুনদের কেবল তিন কর্মের কথাই জানি মশাই।—বাতলাই আমি : সেই তিনটি কর্ম হচ্ছে শাঁখে ফুঁ, কানে ফুঁ আর উনুনে ফুঁ! তিনটি ফুৎকার মাত্র।

—তার মানে? ফুঁয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন কথাটা?

তার মানে ব্রাহ্মণ সন্তানের তিন কর্ম,—আমি আরও বিশদ হই : ওই শাঁখে ফুঁ, মানে শাঁখ ঘন্টা বাজিয়ে ঠাকুর পূজো, কানে ফুঁ হল গে কানে মন্তর ফুঁকে গুরুগিরির ব্যবসা, আর উনুনে ফুঁ হচ্ছে নিজেই ঠাকুর বনে যাওয়া।

ঠাকুর বনে যাওয়া?—হর্ষবর্ধন বোকা বনে যান : নিজেই সাক্ষাৎ ঠাকুর হয়ে যাবে নাকি?

—হবে না? হাঁড়ি-কুড়ি হাতা-বেড়ি হাতে রান্না-বান্নার দেবতা হয়ে যাবে যে! উনি রেঁধে বেড়ে দিলে তবেই তো আমরা ভোগ পাব।

তাই বলুন!—হর্ষবর্ধন হর্ষধ্বনি করে ওঠেন : তারপর এই যে, শুনুন, পুনশ্চ পুনশ্চ দিয়ে কি লিখেছেন উনি তার পরে : 'স্মরণে রেখ যে, আমাদের পুরোহিত বংশে সর্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা শ্রেয়ঃ নয়, সম্ভবও নয়। পাত্রটি বৈদিক শ্রেণীর হওয়াই বাঞ্ছনীয় বোধ করি।' কিছু বোধ করলেন?

—করলাম বই কি। অবোধ্য কী আছে এর মধ্যে? বৈদিক শ্রেণীর পাত্র চান।

—কথাটা স্মরণ রাখবেন।

বলা বাহুল্য বিশেষ করেই স্মরণে রেখেছিলাম কথাটা। তাই কড়িকাঠ-চ্যুত সম্বন্ধসূত্র লাভ করতেই হাজির হলাম তাঁর কাছে কদিন বাদে।

খোঁজ পেলেন পাত্রের?—হর্ষবর্ধন শুধান।

—পেয়েছি। বৈদিক পাত্র বললেন তো? বৈদিক কথাটা তো বেদের থেকেই এসেছে, তাই না? বেদে পাত্র পেয়েছি একজন— বে দেবার পক্ষে সর্বাংশ উপযুক্ত।

বেদে!—শুনেই হর্ষবর্ধন চমকে উঠলেন : বেদে পাত্র? মানে যারা আজ এখানে কাল সেখানে করে বেড়ায়—চালচুলো নেই, যাযাবর, সেই বেদেদের কথা বলছেন?

তাই বলে বর হিসেবে কিন্তু 'যা যা' দূর ছাই করবার নয়।—আমি জানাই : জামাতারূপে বরং বরণীয়। বাইরে বাইরেই চরে বেড়াবে, ঘরজামাই হয়ে কোনোদিন আপনার ঘাড়ের ওপর এসে চড়বে না—এমন পাত্তরকে খারাপ বলছেন?

—সেই ইহুদির সঙ্গে বামুনের মেয়ের সম্বন্ধ এনেছেন আপনি?

—না না, ইহুদি নয়, ইহুদি নয়। বামুনের ছেলেই, তবে কিনা ঐ বৈদিক শ্রেণীর। যাযাবর স্বভাবের।

—বুঝেছি, উড়নচণ্ডী।

—উড়নচণ্ডী না, ওড়াবে কী? ওড়াবার কিছু থাকলে তো! ঘুরনচণ্ডী বলতে পারেন বরং। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

—ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! সে আবার কি?

আজকালকার প্রায় ছেলেই তো তাই মশাই! যাক্ তাতে কিছু যায় আসে না। তবে

কিনা একটুখানি খুঁত আছে পাত্রের। —আমি একটু খুঁটিয়ে বলি।

একটুখানি খুঁত! কী খুঁত?—ভুরু কুঁচকে হর্ষবর্ধন শুধান। তারপর নিজের প্রশ্নের জবাব দেন নিজেই : যাক্ গে। সামান্য খুঁত নিয়ে খুঁত খুঁত করার কেনো মানে হয় না। এই ধরাধামে কেউই ঠিক নিখুঁত নয়। তবু শুনি কি খুঁত।

—পেঁয়াজ খায়!

পেঁয়াজ খায়?—মনে হল তিনি যেন একটা পয়জার খেলেন,—পেঁয়াজ খায়, কী বলছেন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই কথাই বলছি। এই সামান্য একটুকানি যা খুঁত।

—গোস্বামী ঠাকুরের কুলে পেঁয়াজখোর জামাই! এটাকে আপনি সামান্য বলছেন! এই পেঁয়াজ খাওয়াকে?

না, সামান্য বলছিনে। পেঁয়াজ সামান্য নয়। ঠাকুর বলতেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে গেলে শেষ অব্দি যেমন তার কিছুই থাকে না, তেমনি নেতি নেতি করতে করতে এগিয়ে গেলে ব্রহ্মাণ্ড-মায়া বিলকুল গায়েব। এমনকি পরম ব্রহ্মেরও পাত্তা মেলে না তখন। সব লোপাট!—আমি গদগদ কণ্ঠে বলে যাই।

—বলতেন নাকি ঠাকুর? তার মানেটা?

—মানেটা যে কি, তা আমিও ঠিক বুঝিনি। মনে হচ্ছে পেঁয়াজ হোলো গে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড একটা পেঁয়াজি। অর্থাৎ কিনা পেঁয়াজ আসলে মায়াই।



মায়াই হোক আর যাই হোক, মায়া বলে পেঁয়াজকে উড়িয়ে দিল তো চলবে না। বেজায় গন্ধ ছাড়ে পেঁয়াজ। ঠাকুর বংশে তো পেঁয়াজের আমদানি হতে পারে না, মশাই!—হর্ষবর্ধনের কাতর কণ্ঠ।

—সে কথা আপনি বুঝুন। তবে আমি বলছিলুম কি পাত্রটি ভালোই। একটু যা পেঁয়াজ খায়। তাই বলে কি রোজই খায়? তা নয়। মাঝে মাঝে খেয়ে থাকে। এই মাংসটাংস হলেই—

—অ্যাঁ? মাংসও খায় নাকি আবার?

—রোজ কি আর খায়? পাচ্ছে কোথায় রোজ? এই মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়লে মানে বন্ধুবান্ধবরা ধরে পড়লেই খায়।

মাংস খায়!—দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন হর্ষবর্ধন : আমাদের ঠাকুর মশায়ের নিরমিষ বোষ্টম বংশে গিয়ে শেষে মাংস খাবে! কি মাংস কে জানে! নিষিদ্ধ মাংস কিনা তাই বা কে বলবে।

—যা খেয়ে থাকে লোকে সচরাচর, পাঁঠা, খাসি, ভেড়া, কচ্ছপ, হাঁস, মুর্গি—এইসব। মানে, যা পাওয়া যায় বাজারে। গোরু-টোরু কি দুম্বা-টুম্বা খায় না, যদ্দূর জানি। পাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ নিষিদ্ধ নয়, সুসিদ্ধ করেই খায়। নিষিদ্ধ হজম করতে পারবে কেন?

অ্যাঁ! ভেড়া, কচ্ছপ, মুর্গি!—হর্ষবর্ধনের গলায় যেন হায় হায় বাজে : নিরিমিষ গোঁসাই বাড়িতে এসে শেষে মাংস খাবে! ওইসবও খাবে!

খায় বলে কি আর অ্যাতো অ্যাতো? পাচ্ছে কোথায়! একটু আধটু কখনো সখনো খায়। সে-ও ঐ চাটের মুখেই।—হবু জামাইয়ের মুখ রাখতে গিয়ে আমার রোখ চেপে যায়।

চাট!—সদ্য যেন ঘোড়ার চাট খেলেন এমনি ঘোরালো হলো হর্ষবর্ধনের মুখখানা : এর ওপর আবার চাট আছে? চাট তো জানি.....চাট তো জানি...

হ্যাঁ, যা ধরেছেন।—তার বুদ্ধির বহর দেখে আমি উৎফুল্ল হই : খালি খালি কি আর চাট মারে? অকারণে খায় না মশাই।

এর মধ্যে কারণও আছে আবার!—তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে : বৈষ্ণব বংশে শেষটায় শাক্তের আমদানি!

—শাক্ত বলে শাক্ত! ঘোরতর শক্ত। বেজায় শক্তিধর। শুধু সে-ই নয়, ওদের দলটাই। মালগাড়ি লুঠ করা, ওয়াগান ভাঙাই তো কাজ ওদের। শক্তি না থাকলে পারা যায়? আর সেই কারণেই—ওই সব কাজকর্মের গোড়ায় একটুখানি কারণ বারি পান করে নিতে হয়। তবে ঐ একটুখানি। বেশি খাবার মুরোদ কোথায়? পয়সাই বা কই? তাছাড়া........

থামুন! থামুন!—হর্ষবর্ধন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : মালগাড়ি লুঠ! ওয়াগন ভাঙা! কি বলছেন আপনি? তার ওপর আরো সব নেশাভাঙ করে কিনা কে জানে! গাঁজা গুলি ভাঙ চণ্ডু চরস—

যা বলেছেন! ভাঙচুরের ব্যাপার নিয়েই তো রয়েছে। তাই ওসব খেতে হয়। অতো সস্তার নেশা তো আর নেই মশাই! আর হ্যাঁ, গুলিও খায় শুনেছি কখনো কখনো। আমি সবিনয়ে বলি।

—গুলিও খায়? গুলিখোর জামাই?

—খেতেই হয়। কাজের সময় রেল পুলিসের চক্ষে পাড়লে কি আছে? অমনি গুলি! তবে ইচ্ছে করে খায় কি আর? যে বিয়ের যেমন মন্তর! তখন হাসপাতালে গিয়ে কাটিয়ে আসে মাস পাঁচেক।

অ্যাঁ! পুলিসের গুলিও খায়! ওয়াগন ভাঙে, নেশা করে, মাংস খায়, চাট খায়, চুরি-ডাকাতি করে!—পাত্রের গুণাবলীর ফিরিস্তি দিতে দিতে হর্ষবর্ধন ক্রমেই যেন স্তিমিত হয়ে আসেন : এসবের ওপরে ওর আরো কোন ইতরবিশেষ আছে কিনা ভগবান জানেন!

হ্যাঁ, আছে ইতরবিশেষ,—আবার আমার আশ্বাসদান : ওর বন্ধুরাই সেই ইতরবিশেষ। বিশেষ ইতর বলেই তাদের মনে হয় আমার। সত্যি বলতে কি, ছেলেটি খারাপ নয়, পাত্র হিসেবে ভালোই, কিন্তু ওই যে বলে না সঙ্গদোষে লোহা ভাসে! সঙ্গীদের পাল্লায় পড়েই আমাদের ভাবী দুলোহা ভেসে গেল।

—দুলোহা? দুলোহা নাম নাকি ওর?

—না না, দুলোহা ওর নাম নয়। আমাদের দেশের দেহাতী ভাষায় জামাইকে দুলাহা না দুলোহা কী যেন বলে থাকে। তাই বলছিলাম।

রাখুন আপনার দেহাতী কথা!—হর্ষবর্ধন যেন শেষবারের মতো জ্বলে ওঠেন : আপনার কথায় আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে! এমন পাত্র এনেছেন যে!.... শ্বশুরবাড়িতে আমাদের মেয়ের সুখের অন্ত থাকবে না! জামাই যতক্ষণ বাড়ি থাকবে........

আমি বাধা দিই, ভরসা দিই,—কদিন আর থাকবে বাড়িতে? বছরের মধ্যে এগারো মাস তো তার জেলখানাতেই কাটে। বছর ভোরই শান্তি-স্বস্তিতে থাকবে আপনাদের মেয়ে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। সত্যি, ছেলেটা বড় ভালো। জেল থেকে বেরিয়ে তিন-চার দিন বাইরে থাকতে না থাকতেই আবার তাকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিস! আমি তাই.....

বলতে বলতে আমি থেমে গেলাম। হর্ষবর্ধনের চোখে পলক পড়ছে না। শিবনেত্র! সর্বনাশ, দমও বন্ধ! হন্তদন্ত হয়ে তক্ষুণি ছুটলাম ডাক্তারের কাছে— রাম ডাক্তারকে ডাকতে—



হর্ষবর্ধনের দ্বিরাগমন

চেহারা খারাপ শুনলে হর্ষবর্ধন আর খাড়া থাকতে পারেন না। অমনি উনি শুয়ে পড়েন—যদি বিছানার কাছে থাকেন। চেয়ারের কাছাকাছি থাকলে তাঁকে যেন বসিয়ে দেয়।

যেদিন বিকেলে তিনি রাস্তায় ছিলেন, তা, লোকটা যেন তাঁকে পথেই বসিয়ে গেল.....

আনকোরা অচেনা মানুষ, কখনো তাকে দেখেননি এর আগে, মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল আকস্মাৎ।

এগিয়ে এসে, চোখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি রেখে (আর কাঁধে এক হাত) শুধালেন তিনি হর্ষবর্ধনকে 'শরীরটা কী খারাপ বোধ হচ্ছে আপনার ?'

প্রতিবাদের ছলে মৃদুকণ্ঠে হয়ত তিনি কিছু কইতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক— 'বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। বুকের ভেতর কেমন যেন গুরুগুর করছে আপনার।'

সত্যি বলতে বুকের মধ্যে একটা গুরগুরুনি তিনি অনুভব করছিলেন কিছুক্ষণ থেকেই। কিন্তু সেটা শীতের জন্যেই তিনি ভেবেছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর যে ধারণা টলিয়ে দিলেন তক্ষুনি—এক লগুড়ের ঘায়।

বুকের ভেতরকার গুরুত্ব তিনি অনুভব করলেন।

'হার্টফেল করার আগে অমনটা হয়।'-জানালেন ভদ্রলোক।

শুনে হর্ষবর্ধনের যেন খিল লাগলো বুকে। গুড়গুড়ুনিও বন্ধ হবার দাখিল হোলো যেন। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনার এটা কি অনেক কালের বুকের ব্যামো নাকি ?'

'অ্যাঁ ?'

'আগেও কি এমন বুক ধড়ফড় করত আপনার ?'

'কই, মনে পড়ছে না তো, তিনি কন।

'করতো নিশ্চয়ই। ধরতে পারেননি। জানতে পারেননি কখনো। কিংবা টের পেয়েও হয়তো চেপে গেছেন। উচিত হয়নি সেটা। বুকের দোষ এমন করে পুষে রাখলে শেষটায় আপশোষ করতে হয়। বুক কি কখনো কারো পোষ মানে মশাই ?'

ভদ্রলোকের কথাটা খাঁটি বলেই তাঁর মনে হয়। বুকে একটা কুপোষ্যই বটে। বুক কিংবা

ঐ হৃদয় যাই বলা যাক, নিজের বা পরের যারই হোক না, কিছুতেই কখনো পোষ মানানো যায় না। বুকের এই জান্তব্য প্রকৃতি তিনি জানতেন যেন।

সহজেই তিনি সায় দেন তাঁর কথায়—'যা বলেছেন! হাঁ মশাই!'

'এই পোষা রোগ কিছুতেই আপোস করতে চায় না— বুঝেছেন? করোনারি থ্রম্বোসিস হয় তাই থেকেই।

'কী বললেন? কীসের সিস্ অ্যাঁ?' হর্ষবর্ধনের বুকটা থম থম করে।'

'থ্রম্বোসিস্।' মুখ ভার করে কন ভদ্রলোক— 'করোনারি।'

'থাইসিস্ বুঝি?'

'তার চেয়েও খারাপ। থাইসিস্ তো দেখতে শুনতে দেয়। চিকিৎসা রয়েছে তার। ভালো ওষুধপথ্যে সেরেও যায় অনেকের কিন্তু এই থ্রম্বোসিস্ হঠাৎ এসে পাকড়ায়—চোখে কানে দেখতে দেয়না একেবারে।'

'অ্যাঁ?' অ্যাঁ-করাটা তাঁর আর্তনাদের মতই শোনায়। আহত হৃদয়ের থেকে চোঁয়া ঢেঁকুরের মতই ডুকরে ওঠে যেন।

'আর থাইসিস্ তো হয় যতো গরিব-গুবরোর— ভালো করে খেতে পরতে পায়না যারা। তাতে মারা পড়ে যত বাজে পুঁচকেরা।'

'আর আপনার এই সিস্‌টায়?'

'থ্রম্বোসিস? যতো আমীর ওমরারা—বড়লোক যতো সব এতেই যায় তো।'

'হর্ষবর্ধন খতিয়ে দ্যাখেন তখন। না, তিনি গরিব নন। টাকার গণিতে বড়লোক বলেই তিনি গণনীয়। আর পুঁচকে তাঁকে বলা যায় না কিছুতেই। ভুঁড়ির বিপুল পরিধি নিয়ে এমন কলেবরে তিনি কি পুচকে? না, কখনই নন। অতএব, থাইসিস্ নয়, হয় যদি তো থ্রম্বোসিস্ই তাঁর হবে। নির্ঘাত।

'কতোদিনে হার্টফেল করে—ঐ রোগটায়? ঐ রোগে ধরলে—'

কতোদিনে? বলুন, কতোক্ষণে! হার্টফেল করতে সময় লাগে না মশাই। ট্রেন ফেল করার মতই—এক মিনিটের এদিক ওদিকেই হয়ে যায়। থাইসিসেই বরং ধীরে ধীরে তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে—'

'অ্যাঁ?'

'কাশতে কাশতে—সুদীর্ঘকাল ঐ কাশিবাসের পরেই কাঁসি বাজায় মানুষ। কিংবা ঐ পটল তোলে—যাই বলুন।'

'কিন্তু থাইসিস্ তো আর হয়নি আমার—' দীর্ঘনিশ্বাস পাড়েন হর্ষবর্ধন।

'দেখিতো আপানার হাতটা।'—ভদ্রলোক হাত বাড়ান।—'না না, হাতের চেটো নয়। আয়ুরেখাটা দেখতে বলেছেন? ও দেখে কি করবো? ওসব কি আর মেলে মশাই আজকাল? আপানর নাড়িটা দেখতে চাইছি। হুম্, ধরেছি ঠিক। পাল্‌স্ প্রেসার ভীষণ। প্যালপিটেশানটা ঐ জন্যই। দাঁড়ান, একটা ট্যাক্সি ডাকি। আর হাঁটা চলা নয়। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন চট করে। বিশ্রাম করুন। খাওয়া দাওয়া বন্ধ আজ। সাবু, বার্লি, বেদানার রস আর কমপ্লিট রেস্ট। হার্টের একজন ভালো ডাক্তার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি—ঠিকানাটা বলুন তো আপনার?'

দুরু দুরু বক্ষে হর্ষবর্ধন ট্যাক্সিতে গিয়ে বসে ভদ্রলোককে নিয়ে। বসাটাও যেন তাঁর

কাছে দুরূহ ঠেকে। এলিয়ে পড়তে পারলে বাঁচেন যেন! ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করেন—'আমি কি এখুনি, এই ট্যাক্সিতেই মারা যেতে পারি।'

'না মরলেও পারেন যদি রোগটা আপনার গা সওয়া হয়ে গিয়ে থাকে।' ভদ্রলোক জানান—'রোগটা আপনার ক্রণিক কি? এই বুক ধড়ফড় করা?'

হর্ষবর্ধন গোঁ গোঁ করেন, কিছুই ব্যক্ত করতে পারেন্ না।

'ক্রণিক হলে তেমন ভয় নেই, ভয়ের কারণ নেই কোনো। মানে, এখনই কোনো আশঙ্কা নেই এই হার্টফেলের। তবে এরকমের ধাক্কা আরো গোটা কয়েক এলে আর আপনাকে দেখতে হবে না। আজকের তালটা হয়তো আপনি সামলাতে পারবেন—যথাসময়ে যথাস্থানে পেয়েছিলেন আমার ভাগ্যিস। অসময়ে বন্ধু মেলা ভাগ্যের কথা মশাই।'

'আপনি বুঝি ডাক্তার?'

'না, ডাক্তার নই। তবে ডাক্তারি বই ঘাঁটা আছে বিস্তর। হাজার রকমের রোগ আমার নোখে।'

হর্ষবর্ধন তাঁর নোখটা দেখার জন্য ঝোঁকেন।

'না না, এই নোখে নয়। নোখের কোনো ব্যায়রাম নেই আমার। এই নখদর্পণে—সেই কথাই বলছিলাম। রোগী দেখলেই চিনতে পারি। তাই, রোগ ধরতে আমার দেরি হয় না। ওযুধের ক্যাটালগ দেখে দাবাইও বাতলে দিতে পারি মশাই! কিন্তু তার দরকার হবে না। রীতিমত স্পেশালিস্ট ডাক্তারই চিকিচ্ছে করবেন আপনার —পাঠিয়ে দিচ্ছি তাঁকে এক্ষুণি। আমাদের পাড়াতেই থাকেন এক নামজাদা হার্ট স্পেশ্যালিস্ট। কল দিলেই চট করে এসে পরবেন তিনি এক্ষুণি। কিছু ভাবতে হবে না। ঐ যা! আমার একটা জরুরি কল ছিল যে এক জায়গায়। যদি কিছু না মনে করেন, আপনার বাড়ীর পথে দয়া করে যদি নামিয়ে দিয়ে যান আমায়।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। নামিয়ে দেব বইকি।' হর্ষবর্ধন কৃতজ্ঞতায় গদগদ।

'যেখানে নামব সেখান থেকেই ফোন করে ডাক্তারকে আপনার ঠিকানায় যেতে বলব।'

হর্ষবর্ধনের আপত্তির কোন কারণ দেখা গেল না। যে নাকি তাঁকে পরলোকের পথ থেকে ঘুরিয়ে আনে, তেমন আপনার লোকের জন্যে একটুখানি ঘুরে যাওয়া এমন কিছু কঠিন বলে তিনি বোধ করেন না।

গোপাল নগরের মোড়ে তাঁর বাসা। সেখানে পৌঁছতে হাতিবাগান পাঁচ মাথার মোড় পাইকপাড়া ঘুরে, এমনকি সারা কলকাতায় ঘুরপাক খেতে যেতে হয়, বেহালা হয়ে আলিপুর হয়ে আলিপুরের কোনো এক টেরেসেই যেতে হয় তাঁকে তাতেও আপত্তি নেই। তিন টাকার জায়গায় তিপ্পান্ন টাকা উঠে গেল ট্যাকসি মিটারে। ওই একটুখানি ঘুরতে গিয়ে, কিন্তু তিনি তা গায় মাখলেন না।

ঘরে ঢুকেই গোমড়া মুখে পড়লেন তিনি গোবরাকে নিয়ে—'তুই তো আদপে গেরাহ্যিই করিসনে। কী দারুণ শক্ত ব্যারাম আমার—'

'শক্ত ব্যারাম? শুনেই ভায়ের চোখ চড়কগাছ।'

'শক্ত না? একেবারে শীর্ষে উঠে গেছে।'

'শীসে? সে আবার কি?'



'শীসে মানে শীর্ষদেশে। ধানের শীস তো ধানের শীর্ষ দেশকেই বলা হয়। হতভাগা মুখ্যু তাও তুই জানিসনে কতোদিন বলেছি না যে আমার শরীর বড় খারাপ। কোনো একটা ভারী ব্যারাম আমাকে ধরেছে। এখন হোলো? হোলো তো এখন?'

'কী হোলো তোমার দাদা?' দেখে শুনে গোবরা তো হতবাক।

'কী আবার হবে? একেবারে শীসে উঠে গেলাম আমি। সেখান থেকে কে নামায়, কবে নামি, কে জানে!'

'তা হলেও ঐ শীসের ব্যারামের নাম তো আছে একটা? নেই?'

'ভারী বিদঘুটে ব্যারাম রে। যা হলে বুক ধড়ফড় করে।'

'সে তো পেট গরম হলেও করে।'

'তোকে বলেছে! পেট গরম হলে হার্টফেল করে কেউ? করোনারি হয়ে মারা পড়ে

কেউ ?'

'করোনারি ! ও তোমার ঐ হাত কাঁপার কথা বলছো ? বাত হলেও তা হয়।'

'ধুত্তোর বাত ! তোর সঙ্গে কোনো বাতচিত করতেই ইচ্ছে করে না আমার। এক নম্বরের আহাম্মোক তুই। করোনারির সঙ্গে ঐ হাত কাঁপার সম্পর্ক কোথায় শুনি ?'

'ঐ কথায়। কর মানে হাত, আর নাড়ি মানে নাড়া —নাড়ানাড়ি—তার মানেই তোমার হতা কাঁপানো । তবে হ্যাঁ, নারি আবার মেয়েছেলেও হয় বটে।'

'ধুত্তোর মেয়ে ? মেয়ের নিকুচি করেছে। মেয়ে নয়রে বাবা। করো নারি শীস হচ্ছে কথাটা। নারি আর শীসের মধ্যে বেমক্কা একটা কথা রয়েছে, মনে পড়ছে না কিছুতেই—মোদ্দা কথা, তার মানে বুক ধড়ফড় করা।

'বুঝতে পেরেছি, করবেই তো বুক ধড়ফড়। হিড়িম্বা মার্কা কোনো মেয়ে যদি হাত নাড়ে কি শীস দিয়ে কোনো ইসারা করে তাহলে কি বুক ধড়ফড় করবে না ? ইয়া ইয়া পাঠ্ঠা জোয়ানেও প্রাণ কেঁপে উঠবে। এমন কি, হিড়িম্বার ঐ কাণ্ড দেখে সাক্ষাৎ ওই ঘটোৎকচও উলটে পড়বে, আমি বলতে পারি। কিন্তু তুমি দাদা, গুরুজন, তোমার কাছে সব রহস্য বলা যায়না—তুমি কী বুঝবে ?'

দাদার বুকের গুরগুরুনির গুরুত্বের দিকটা কিছুতেই তাই সে বেঁফাস করতে পারে না। চেপে যায়।

হর্ষবর্ধন স্বয়ং তখন ভায়ের কাছে বিশদ হন। ব্যক্ত করেন আস্তে আস্তে। দুপুরের ব্যাপারটার আগাগোড়া হুবহু। শুনে টুনে গোবরা বলে—'বুঝেচি, আর বলতে হবে না। লোকটা তোমার ঘাড়ে চেপে নিজের বাড়ি ফেরার জন্যেই এই চালাটা চলেছে।'

'আমার ঘাড়ে চেপে ?' ভায়ের কথায় দাদাকে খাপ্‌পা হতে হয়।

'ঘাড় না হয়ে ট্যাকসিই হোলো না হয়। একই কথা। নইলে তোমার ইয়া বুক—এমন লম্বা চৌরা—আর এইসা ছাতি—যা খোলা যায় কিন্তু কিছুতেই বোজানো যায় না, এর মধ্যে কোনো গলা ঢুকতে পারে ?'

গোবরার কথাটাও মনে লাগে দাদার। নেহাৎ মিথ্যে বলছে না সে—'হ্যাঁ, যা বলেছিস ! তা ছাতি একখান বটে। খোলা যায়, তবে এই শীতকালে যায় না। খুললে এখুনি বুক গুড় গুড় করে হার্টফেল হয়ে যাবে হয়ত। ফলে যাবে লোকটার কথা।'

'খুলতে হবে না, বোজাই থাক।' ভাই কয়—'তবে রোগ ব্যারাম কিছুই হয়নি তোমার। লোকটা এক নম্বরের জোচ্চোর। মিথ্যেবাদী চালিয়াৎ। ফক্কর ফাজিল। পাজি ইষ্টুপিট। পরের পয়সায় ট্যাকসি চাপার ফিকিরে ফেরে।'

'ফেরেববাজ একজন ? বলছিস তুই ?'

'বলবই তো। সত্যি কিনা দেখতে পাবে এক্ষুনি। ডাক্তার পাঠাবে বলেছিল না লোকটা ? তা আর পাঠিয়েছে। দেখে নিয়ে তার ডাক্তার ভুলেও এ পথে পা বাড়াচ্ছে না। দেখো তুমি।'

দেখলেন হর্ষবর্ধন। সারাদিন ধরেই দেখলেন। হার্ট স্পেশালিস্ট দূরে থাক, কোনো কম্পাউণ্ডারের টিকিও দেখা গেল না একদম্।

'খুব অসুস্থ বোধ করছেন কি আপনি ?' সামনে পড়ে কে যেন এসে শুধালো হর্ষবর্ধনকে হঠাৎ। আর একদিন। 'খারাপ বোধ হচ্ছে খুব ?'

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দ্যাখেন একবার। তার পর কন—'হচ্ছিল না, তবে এখন হচ্ছে। বেশ হচ্ছে।'

'কী হচ্ছে বলুন তো?' দুশ্চিন্তিত ভদ্রলোককে দারুন জিজ্ঞাসু বলে বোধ হয়।

'ঐ খারাপ বোধটা। এই আপনাকে দেখেই—এই মাত্তর।'

'তার মনে, মাস দুয়েক আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল না? চিনতে পেরেছি আপনাকে। সেই থম্বোসিসওয়ালা—আপনিই না মশাই? হাড়ে হাড়ে চিনেছি আপনাকে। না মশায় না। কিছু অসুস্থ বোধ করছিনে, ভালো আছি বেশ, বহালতবিয়তে দস্তুর মতই, তোফা আছি, খাসাও বলা যায়—বুক ধড়ফড় টড়ফড় কিছু আমার নেই, কি আশ্চয্যি, আপনি একটা লোককে দুবার ঠকাতে এসেছেন? একটা খাসিকে কবার জবাই করবেন মশাই!'

'খাসা! বলেছেন খাসা। খাসি বলছেন নিজেকে। খাসা! তবে খাসির চেয়ে মোষ বলাটাই মানাতো আপনাকে মশাই!'

'চুপ্।' বলে হর্ষবর্ধন কথাটার রাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ করে দেন সঙ্গে সঙ্গে—'চুপ করুন। খামোষ!'

'না মশাই! যতো করেই বলুন না। আপনাকে আমি খেতে পারব না। খেলে হজম হবে না।'—ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন—'তবে পুলকিত হয়েছি খুব—আপনার কথায়। আসুন আপনার সঙ্গে কোলাকুলি করি।'

'রক্ষে করুন, খুব হয়েছে!' তিন পা পিছিয়ে আসেন তিনি।—'আর আপনার ওই কোলাকুলিতে কাজ নেই। বুঝতে পেরেছি আপনার মতলব। কোলাকুলির ছুতোয় আপনি কিছু একটা শুঁকিয়ে দেবেন আমায়, অমনি আমি বেহঁস হয়ে পড়ব— তারপর হঁস হলে দেখব—'

'দেখবেন যে তাঁর জুঁতো নেই, জামা নেই, পরণে গামছা, পকেট ফাঁকা, ট্যাঁক ঘড়ি আর মনি ব্যাগ লোপাট। একটা অন্ধকার ঝুপরির ভেতর ঘুপটি মেরে শুয়ে রয়েছেন। আজ সকালের কাগজেই এমন ধারা দুর্ঘটনার খবর তিনি পড়েছেন। না, সেই নাজেহালের মধ্যে পা বাড়াতে তিনি নারাজ। সাধ করে কে গলা বাড়িয়ে বদমাসদের বগলে যায়? বিপাকে পড়ে খাবি খায়?'

এক পা এক পা করে তিনি পেছোন। ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায়। কিন্তু কপালে বেহঁস হওয়া থাকলে কে আটকায়? রেহাই আছে তার থেকে?

হঁস হলে তিনি দেখতে পান যে শুয়ে আছেন—খুপরি ঝুপরির ভেতরে নয়—নিজের ঘরেই! খাটের উপরে, হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গোবরা বসে তার পাশটিতে।

'কী হয়েছে রে গোবরা? আমার হাতে পায়ে ব্যথা কেন রে?'—কাতর স্বরে তিনি শুধান ভাইকে।—'কী হয়েছে আমার?'

'এমন কিছু হয়নি দাদা। মোটরের চোট লেগেছে একটু, না না, মোটর চাপা পড়োনি তুমি। তুমি যে সময়ে ফুটপথে থেকে নামছিলে না? সেই সময় একটা ট্যাকসি তোমার পিছনে এসে ধাক্কা মারে সেখানে। তার ধাক্কায় তুমি পড়ে যাও। একটু চোট লেগেছে তাইতেই। তাও এমন কিছু না, হাত পায় এক আধটু ছড়ে গেছে—এই মাত্তর। দুচার দিনের মধ্যেই তা সেরে যাবে, ভয়ের বা ভাবনার কোনো কারণ নেই, বলে গেছেন ডাক্তার।

'আর সেই লোকটা ?' হর্ষবর্ধনের মনে পড়ে তখন—'আমার ঘড়ি, মণিব্যাগ, ফাউন্টেন পেন ?'

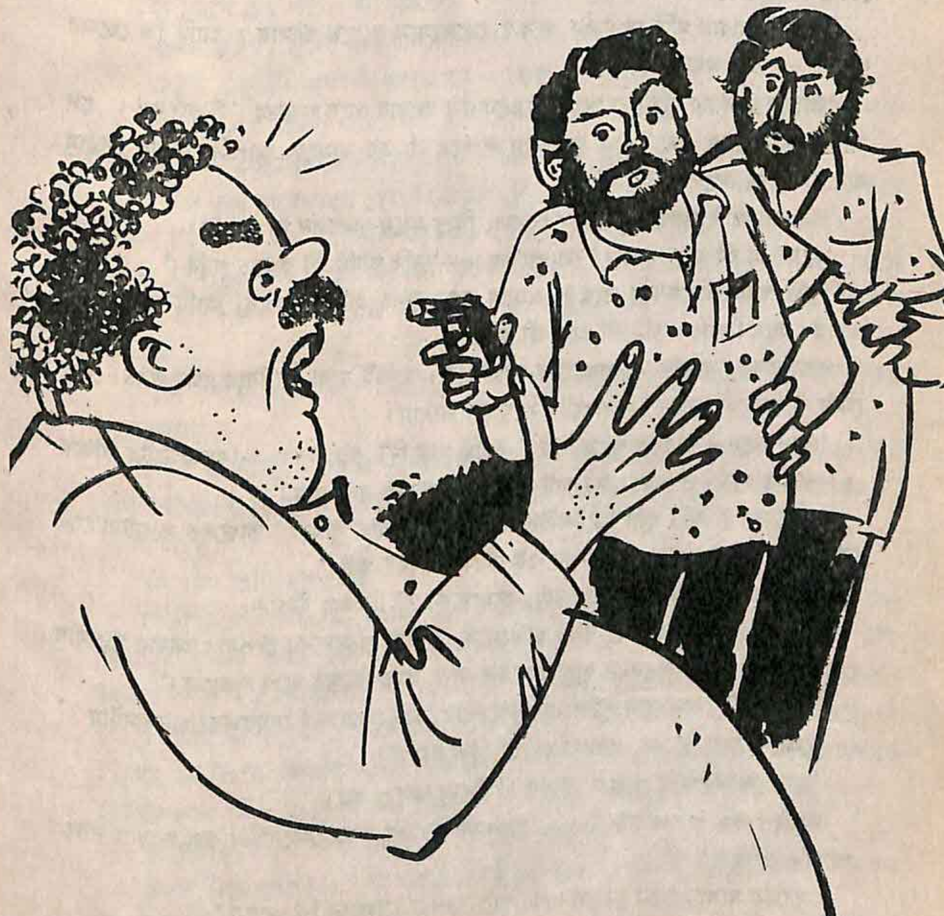
'সব ঠিক আছে। ছোঁয়নিকো কেউ, ট্যাকসিওয়ালা লোক খুব ভালো। তক্ষুনি নিজের ট্যাকসি করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে এখেনে। পকেট-টকেট মারেনি কেউ। আর সেই ট্যাক্সিওয়ালা—এমন লোক প্রায় দেখা যায় না। মীটারে যা উঠেছিল তার বেশি একটা পয়সাও সে চায়নি। বড় ভালো লোক।'

'আমার ঠিকানা সে জানলো কি করে ?'

'তোমার যে বন্ধুটি সঙ্গে ছিল সেই তাকে বলে দিয়েছে তোমার ঠিকানা।'

'আমার বন্ধু ?'—হর্ষবর্ধনের তাজ্জব লাগে—'বন্ধু আবার কে ছিল রে আমার ?'

'তোমার সঙ্গে ছিল যে, তাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতেই তো দেরি হলো ট্যাক্সিওয়ালার। নইলে তোমার আরো ঘণ্টাখানেক আগে সে আনতে পারত। আলিপুর



না চিড়িয়াখানায় কোথায় যেন থাকেন তোমার বন্ধুটি। গড়পারে না কি গড়ান হাটায়। সে সব জায়গা ঘুরে যেতেই এই বিয়াল্লিশ টাকা পড়েছিল। নইলে তিন টাকার মধ্যে সে এনে ফেলতে পারতো।'

'যাকগে বিয়াল্লিশ টাকা!' হর্ষবর্ধন টাকার কথাটা চাকার মত উড়িয়ে দেন—'অসময়ের বন্ধু তো! আর বাহাদুরও বলতে হয় লোকটাকে। মোটর ছাড়া যে এক পা নড়ে না, তাও আবার নিজের পয়সায় নয়। কিন্তু আমি ভাবছি, রোজকার ট্যাকসি ভাড়াটা তার না হয় পরের ট্যাঁক থেকেই আসে, সে নিজের পেট চালায় কি করে? কার ঘাড় ভেঙে খায় তাই আমি ভাবছি।

হর্ষবর্ধক হর্ষবর্ধনের আর এক কাহিনী বলি।

সেদিন হর্ষবর্ধনের বাড়ি গিয়ে দেখি ভারী তুলকালাম কাণ্ড! দারুণ তাঁর মার মার কাট কাট!

'কী! কী হয়েছে মশাই?' আমি বলি—'হঠাৎ এমন মারমুর্তি ধরেছেন কেন? এমনটা তো দেখিনি কখনো।'

'আমার আবার মুর্তি দেখলেন কবে? ছেলেমেয়ে হয়েছে আমার? আমি কি ছেলের বাপ?'—তাঁর জবাব সাফ।

'তাহলেও মামার মুর্তি তো দেখাবেন আমায়? আমার কাছে অন্ততঃ।' টিকলু কয়। সে আমার সঙ্গে ছিল। 'আমি কি আপনার ভাগনে না হর্ষ মামা? আপনি আমার শিব্রাম মামার বন্ধু যে কালে—'

উনি ওর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন কেবল, কিন্তু কানে তুললেন না কথাটা।

'হয়েছেটা কী বলুন তো?' সে শুধোয়।—'দেখি আমি কী করতে পারি।'

'তুমি আর কী করবে তার? আমার রক্ষা কবচ হারিয়ে গেছে, আমি মারা পড়ব এবার। মরব নির্ঘাৎ। তুমি কী আর কী করবে।'

রক্ষা করব। রাতদিন পাহারা দেব আপনাকে। আমিই হবো আপনার রক্ষা কবচ। দেখি কেটা কী করতে পারে।'—দাপটের সঙ্গে সে জানায়।

'তা পারলেও পারতে পারে বটে।' আমি সায় দিই ওর কথায়—'বয়স্কাউটের লীডার ও। পাড়ার গার্ড। তাছাড়া ছোট খাট একটা গোয়েন্দাও বলা যায়।

'গোয়েন্দা? ঝুরি ঝুরি ডিটেকটিভ বই পড়া গোয়েন্দা বুঝি?' তাহলেও কথাটায় যেন উনি একটু আশ্বাস পান—'কাজটা ওই টিকটিকিদেরই বটে।'

'তাহলে ঠিক ঠিক বলুন তো মামু, হয়েছে কী?' টিকলুর টিক্কনি।

'বললুম না আমার রক্ষা কবচ হারিয়েছে, আমার গুরুদেবের দেওয়া। আমার মৃত্যুবাণ খোয়া গেছে। রাবণের যেমন মৃত্যুবাণ ছিল না? মর্মর স্তম্ভের মধ্যে লুকানো।'

'আপনারটা কোনখানে লুকোনো ছিল দেখান কোন দেয়ালে? দেয়ালের কোনখানটায়?'

'কোনো দেয়ালে নয়, আমার হাতেই ছিল তো।'

'হাত থেকে খোয়া গেল? সে কি!' টিকলু অবাক হয়।

আমিও কম অবাক হই না।—'আপনার হাতের কবচ কোনোদিন তো আমার নজরে পড়েনি মশাই?'

'হাতের মধ্যে হাতার ভেতর ঢাকা থাকত না? দেখবেন কি করে?'

'তাই বলুন। তা, কতো বড়ো হবে কবচটা? সোনার না কি?'—শুধোই।

'সাধারণ মাদুলির মতই সাইজ। মাদুলি যেমনটা হয় না—তেমনটাই। সাধারণ তামার মাদুলি। ওর ভিতর গুরুদেবের রক্ষামন্ত্র পড়া রয়েছে কিনা—কবচ বলা হচ্ছে সেই জন্যেই।'

'তাই বলুন!' টিকলু হাঁফ ছাড়ে—'আপনার ঐ কবচ আমি খুঁজে দেব এক্ষুনি।'

'তা ঐ মাদুলির জন্যে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন আপনি? খোঁজাখুঁজি করেও সেটা নিতান্তই যদি না মেলে তো কী হবে তা হলে? স্বর্গ রসাতল হয়ে যাবে না।'

'বললাম না, আমার মৃত্যুবাণ। ওটা হারালে আমি প্রাণ হারাব। ধনে প্রাণে মারা পড়ব আমি। এখন ক্ষণে ক্ষণে আমার মৃত্যু ভয়। মুহূর্তে মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা। ব্যবসাপত্তর সব ডকে উঠল। সবাই মিলে সবংশে গোল্লায় যাবার ধাক্কা। এখন তখন অবস্থা যাকে বলে না? ঠিক তাই এখন।'

'তাই নাকি? তাহলে বলুন, আমি যদি আপনার মাদুলিটা বের করে দিতে পারি কী দেবেন আপনি আমাকে?'—টিকলুর জিজ্ঞাস্য।

'যা চাইবে তাই পাবে। কী চাও?'

'একটা স্কুটার। মানে, তার দামটা হাজার দশেক টাকা।'

'এক্ষুনি এক্ষুনি।' হর্ষবর্ধন সম্মত হন—'বার করে দাও তাহলে।'

'খুঁজে দেখি।' টিকলু এঘরে ওঘরে খোঁজাখুজি করে। আমিও এধার ওধার আতিপাঁতি করে দেখি— কোনোখানেও পলাতক মাদুলির টিকিটি দেখা যায় না।

আমিও তার সাথে সাথে হেথায় হোথায় ঘুরি। ঐ ঘোরাঘুরিই সার। আমি বলি—'খুঁজে দেখবি কি তুই? ওর আবার পাত্তা পাবি নাকি? তুই ভেবেচিস ওরা অচল পদার্থ, হাত থেকে খসে কোথাও নির্জীবের মতন বসে রয়েছে? এর মধ্যে হিল্লি-দিল্লী চলে গ্যাছে ব্যাটা। জড় পদার্থ হলেও বেজায় নঝঝর। এক নম্বরের ধড়িবাজ ওরা—বেজায় হুঁশিয়ার বদমাইস!'

'তুমি বলছো কী মামা? নেহাৎ নির্জীব একটা মাদুলিকে মিলখা সিং বানিয়ে দিচ্ছো একেবারে।'

'সাধে কি দিচ্ছি। আমি ওদের স্বভাব জানি যে। ওদের হাবভাব আমার সব জানা—ঐ অপদার্থদের। হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়ে আছে আমার। দস্তুর মতন নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি আমি।'

'কী রকম শুনি একবার?'

'শোন্ তবে—তাহলেই বুঝবি তোর হাজার খোঁজা-খুঁজিতেও কোনো লাভ হবে না, হয়রানিটাই সার হবে। একটা আধুলি আমার ট্যাক থেকে খসে পড়েছিল একবার—তার বিবরণ শোন। ঘরের মধ্যেই পড়ল। ঠং করে আওয়াজ পেলাম। কানে শুনলাম, কিন্তু চোখে পড়ল না মোটেই। কোথাও নেই আধুলিটা। ঘরের মধ্যেই পড়ে সাড়া দিয়ে এর ভেতরে সে উধাও হল কোথায়? সারা ঘরে পাত্তা নেই। দেখতে দেখতে চক্ষের পলকে কোথায় গেল সে? না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

'কাছাকাছি কোনো ব্যাঙের কাছে খবর নিতে পারতে।'

'ব্যাঙ্কে গিয়ে খবর নেব? কামারখানায় ছুঁচের খবর? যেখানে হাজার লাখ লাখ টাকার কারবার, একটা আধুলির খোঁজে যাব সেখানে?'

'ব্যাঙ্ক নয় মামা, ব্যাঙ। ব্যাঙরা আধুলি জমায় শোনোনি?'

'কিন্তু ব্যাঙের কাছে যাবার পাত্র নয় আধুলিরা। ওরা তো বোষ্টম না যে ভেক ধরবে?'

'তবে গেল কোথায় আধুলিটা?'

'যাবে কোথায়। পড়বার পরই লাফিয়ে উঠেছিল টঙ্ -এর ওপর। সেখানে ঘুলঘুলির ফাঁকে আরামে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল আমার কার্যকলাপ। তারপর একটা চড়ুই পাখির কাছে ঠ্যাঙানি খেতেই না—'

'চড়ুই পাখি তাকে ঠ্যাঙাতে গেল কেন?'

'চড়ুই পাখি তো আর ব্যাঙ নয়, আধুলির কদর বুঝবে কী! ঘুলঘুলি পা দিয়ে গোড়াতেই শুট করে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেজেয়। ঠ্যাঙ -এর মার খেয়ে ঠং করে উঠতেই আমি দেখতে পেলাম। ধর্ ধর্ ধর্—ধরতে গেছি। আমার চোখের ওপরই সট্‌কে পড়ল কোথায়! আর তাকে দেখতে পাই না। সন্দেহ হল ঘরের নর্দমা দিয়ে গলে মেন্ পাইপের নল বেয়ে নেমে গেছে নীচোয়। ছুটলাম তলায়। না, সেখানেও নেই, ড্রেন দিয়ে গলে গেছে সটাং। তারপর অনেকদিন বাদ গঙ্গার ঘাটে তাকে কুড়িয়ে পাই।'

'সেটাই?'

'সেটা ছাড়া আর কেউ নয়। আণ্ডার গ্রাউণ্ড পয়ঃপ্রণালী বেয়ে সাগর-সঙ্গমে বেরিয়েছিল বোধ হয়, পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার।'

'তা, নচ্ছার তাকে বলতে পারো মামা। ছারপোকা নয় যখন।'

'তাই বলছিলাম। এখানে মাদুলির কোনো পাত্তা পাবিনে। পেতে হলে যেতে হবে তোকে সেই ডায়মণ্ড হারবার।'—আমি বাতলাই।

'দ্যাখো না, বার করছি ব্যাটাকে এক্ষুনি। আমার হাতেই আছে সে।'—বলতে বলতে সে তার মুঠোর ভেতর থেকে সে মাদুলিটাকে বার করে দেখাল।

'অ্যাঁ, ভেলকি নাকি!' চমকে গিয়ে বলি—'যাদুকর পিসি সোরকারের সাকরেদগিরি করেছিল নাকি কখনো! কি করে বার করলি শুনি?'

'ওই রকম। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। ইচ্ছাশক্তি যার নাম।'

হর্ষবর্ধনের হাতে মাদুলিটা দিতেই তাঁর মুখখানা মুহূর্তে যেন ক্লাইব স্ট্রীট হয়ে গেল। বত্রিশ পাটি বিকশিত করে তিনি ফস্ ফস্ চেক লিখতে বসলেন।

'দশ হাজারের জায়গায় আমি এগারো হাজার দিলাম তোমায়। তুমি আমার জীবনদান করলে। ধনে প্রাণে বাঁচালে আমায়।'

'এক হাজার বেশি কেন মামা? ও আমার চাইনে।' টিকলু বলে।

'ঐ হাজারখানেক দিলাম তোমার খাবার জন্যে। কিছু খাও দাও গে—কিনে টিনে।'

'অতো আমি খেতে পারি? আমি কি হাতী নাকি?'

'একদিনে না পারো, পাঁচ দিনে খাও—দশ দিনে, বিশ দিনে, ত্রিশ—চল্লিশ—পঞ্চাশ—দুশো দিন ধরে খেয়ে ওড়াও।'

'এসো শিব্রাম মামা, চলো স্কুটার কিনি গে। তুমি পছন্দ করবে।'—বলে আমাকে টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

'আগে যাব ব্যাংকে, এটা ভাঙাবো। তারপর যাবো চাংগোয়। ভালো মন্দ কিছু পেটে দিয়ে সোজা যাব স্কুটারের দোকানে।'

শাবার কথায় সঙ্গে যাবার উৎসাহ দেখা দেয় আমার। উল্লসিত হয়ে কই—'তা তো হোলো, কিন্তু মাদুলিটা তুই বার করলি কি করে? না শোনা পর্যন্ত আমার ঘুম হচ্ছে না।'

'এখানে ঘুমোবে কি? এখন কি ঘুমোবার সময়? খেতে যাচ্ছি না আমরা। খেয়ে দেয়ে তার পরে না ঘুম? এখন খাবার ধুম। পাঁচশো টাকার খানা খাবো আজকেই দুজনায়। ফাঁক করবো চাংগোয়া।'

'ঘুম দূরে থাক, আমার খিদেই পাচ্ছে না শুনলে। চলতেই পারছি না বলতে গেলে।'—আমি যেন চলচ্ছক্তিহীন নট্ নড়নচড়ন হয়ে পড়ি হঠাৎ।

'শুনবে নিতান্তই? শোনো, কিন্তু বোলো না কাউকে। ওই হর্ষমামাকে তো কখনোই নয়। ছোটো বেলায় আমায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছিল, তাই মা আমায় একটা মাদুলি পরিয়ে দিয়েছিলো।'

'কই, দেখিনি তো কখনো।'

'হাতে পরলে খারাপ দেখায়, বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাই কোমরের ঘুনসিতে লুকোনো থাকত। তুমি যখন তাকাচ্ছিলে না, সেই সময় ঘুনসিটা ছিঁড়ে, য়্যাদ্দিন প্রায় পচে গিয়েছিল ঘুনসিটা—বের করে নিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? কিন্তু হর্ষবর্ধন ওটাকেই নিজের মাদুলি বলে চিনলেন কি করে?'

'চিনবেনই। চিনতে হবে আমি জানতাম। সব গোরু আর চীনেম্যান যেমন একরকম, একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করে চেনা যায় না, তেমনি সব মাদুলিরই এক চেহারা।

'তা বটে।'—কথাটা মানতে হয় আমায়—'কিন্তু ছোটবেলায় তোকে পেঁচোয় পেয়েছিল বলে শুনিনি তো আমি। জয়া তো বলেনি আমায়।'

'ছোটবেলায় তুমিই আমায় বেশি করে পেতে তো তুমিই ধরতে আদর করতে বেশি। তাই—পাছে তুমি শুনে কষ্ট পাও বলে তাই আর বলেনি তোমায় মা।'

'শেষটায় আমাকেই প্যাঁচা ঠাওরালো সে।'

'না না, তা নয়। প্যাঁচার মতন দেখতে কি তুমি।—সে আমায় সান্ত্বনা দেয়।—'তোমার কথাবার্তা কেমন যেন পাঁচালো। লেখা টেখাও। তাই না? সেইজন্যেই হয়ত মা ওই রকম ভেবে থাকবে। তুমি কিছু মনে কোরো না মামা।'

ট্যাকসির দাপটে ততক্ষণে আমরা চাংগোয়ার টেবিলে এসে পড়েছি।

তখন কে আর ও সব কথা মনে করে?

চাংগোয়ার থেকে চব্যচোষ্য করে বেরুলাম আমরা। বেরুলাম তো, কিন্তু অতো খাওয়ার পর নড়া চড়ার শক্তি নেই আমার। খাই আর শুই—খাওয়ার পর বিছানায় গড়িয়ে পড়ার অভ্যেস চির-কালের, কী করা যায় এখন?

অবশ্যি চাংগোয়ায় আরও খানিক বসা যেত, বসতে দিতো না যে তা নয় কিন্তু অমনি না, আরো কিছু খেতে হোতো হয়ত ওর ওপর। কিন্তু সেটা হত আমার পক্ষে সাপের বেলায় ছুঁচো গেলার মতই। ছুঁচো গিলব কি সামান্য একটা ছুঁচ গলাবারও জায়গা ছিল না কোথাও।

টিকলু বলল, 'আমার বাইকের ব্যাকসীটে এসে বসো মামা। আমি তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বলেছিল সে ঠিকই, কিন্তু আপত্তি দেখা গেল আমার দিকে। একটা বাচ্চা ছেলের পিছনে বসে তার কোমর জড়িয়ে যাওয়াটা যেন কেমন দেখায় না? অন্ততঃ আমার ন্যায় এক মোটাসোটা লোকের পক্ষে তেমন শোভা পায় না।

অগত্যা সে একাই আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

আমি চাংগোয়ার সামনেই হঠাৎ একটা ন নম্বরের বাস পেয়ে সোজা চলে গেলাম আমার এক ভাইপোর বাড়ি। গিয়ে ভাইপোটির কাছে ভাগনের নগদবিদায়ের বার্তা বলি।

শুনে সে বললে—'এ আর এমন কী নগদবিদায়! আমি এর তিন ডবল নগদবিদায় হাতে হাতে আদায় করতে পারি হর্ষকাকার কাছ থেকে।'

'কি করে?'

'কোনো হাতাহাতি না করে। জানতে চাও? অনেক দিন থেকেই আমার মাথায় একটা প্ল্যান খেলছে। এবার সেটা কাজে লাগাবো। আটঘাট বেঁধে তার নক্সা করা।'

'কোনো নক্শালী কারবার না তো রে? ওসবের ভেতরে যেয়োনা বাপু। মেরে ভূত বানিয়ে দেবে পুলিস।'

ভাবিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন হর্ষবর্ধনের বাড়ি যেতেই তিনি বললেন—'কাল রাত্তিরে এক অভাবিত কাণ্ড হয়ে গেছে মশাই। নক্শাল সেজে একদল চ্যাংড়া আমাদের আক্রমণ করেছিল।'

'নক্শাল সেজে—বুঝলেন কি করে?'

'মুখে দাড়ি গোঁফ লাগানো ছিল যেন। বাচ্চাদের কি গোঁফ দাড়ি বেরয়? বিলকুল ঝুটো দেখলেই তা বোঝা যায়। টেনে দেখলে টের পাওয়া যেত কে তারা?'

'চিনতে পারেননি কাউকেও?'

'কি করে চিনব? দাড়ি গোঁফের আড়ালে ছেলেদের চিনতে পারে কেউ? মেঘের আড়ালে চাঁদ বোঝা যায়?'

'বোঝা যায়। তা বটে?'—আমি হাঁফ ছেড়ে বললাম।

'দেখতাম টেনে একটার।'—বলল গোবরা—'কিন্তু হাতে পিস্তল ছিল যে, সাহস হোলো না আমার।'

এমন সময় একটা পুঁটুলি হাতে ভাইপোরত্নটি হাজির।

এসেই বলে—'হর্ষকাকু, এমনটা আপনাদের কাছে আমরা আশা করিনি কখনো। এরকম করলেন আপনি আমাদের সঙ্গে?'

'কী করলাম বাবা?'—হর্ষবর্ধন হতবাক।

'এই নিন আপনাদের সব গয়নাগত্তর।' —বলে পুঁটুলিটা সে সামনে রাখে।

শ্রীমতী হর্ষবর্ধিনীর তাবৎ অলঙ্কার তার ভেতর পাওয়া যায়। তিনি এসে খুঁটিয়ে দেখে নেন, তারপরে কী দেখে কন—'এটাও কি আমার গয়নার মধ্যে ছিল?'

'পিস্তল দেখছি।'—হাতে তুলে দেখেন হর্ষবর্ধন।—'না, ছিল না তবে একই জিনিস।' সে জানায়—গয়নাও যা এটাও তাই—এক কিসিমের ঝুটো মাল। তাই এক সঙ্গে দিয়ে গেলাম। ওটা নিয়ে কী হবে আর আমাদের? কিছুই হোলো না তো।'

'তুমি এরকম ছলনা করলে কেন ছেলেদের সঙ্গে?'—হর্ষবর্ধন গিন্নীর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন—'এটা তোমার উচিত হয়নি গিন্নী।'

আজকালকার দিনে এক-গা গয়না পরে হাটে বাজারে কেউ বেরয় নাকি? আসল জিনিস তো ব্যাংকের সেফটি ভলটে থাকে। ঝুটো গয়না গায়েই বেড়ায় সবাই।'—গিন্নীর কৈফিয়ৎ।

'তাহলেও বেচারাদের বিড়ম্বিত করা হয়েছে। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।'—কর্তার বক্তব্য।

'লজ্জা পাচ্ছি। সত্যিই।'—ওঁর গিন্নীর জবাব—'কিন্তু কী করে জানব যে ওনার ভাইপোরা এসে এমন হামলা করচে হঠাৎ! উনি তো ঘুণাক্ষরেও জানাননি আমাদের আগে। জানলে পরে ব্যাংক থেকে কিছু না হয় তুলে এনে রাখতাম।'

'যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এর জন্যে দায়ী—বুঝলে?'—তিনি হাত তুলে দেখান—'কাল আমার এই মাদুলিটা হারিয়ে গেছল না। টিকলু এসে বার করে দিল যে। তা না হলে সর্বনাশ আমাদের হতই' ঠিক। তোমরাও খাঁটি জিনিস পেতে। এর জন্যে দায়ী উনিও নন, তোমরাও নও, এই মাদুলিটাই। বুঝেচ?'

'যাক তোমরা কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমাদের নগদবিদায়ও কিছু মন্দ হবে না। এই ধরো একশ টাকা। সবাই মিলে ফূর্তি করো গিয়ে।'

একখানা বড় নোট তার হাতে তিনি ধরিয়ে দিলেন।

ঈষৎ গোঁফের রেখার মত একটুখানি হাসি ফুটল তার মুখে। গোঁফের রেখার ঠিক তলাতেই দেখা গেল সেটা।



'হর্ষবর্ধন' মানেই হর্ষবর্ধক—হাসাতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবার দশা। সঙ্গে গোবরা আর শিব্রাম তো আছেনই। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে অবিস্মরণীয়।

তো সেই বিশাল বহু, মাছি গোঁফ ও কোঁকড়া চুলের হর্ষবর্ধনই সসঙ্গী এই বইয়ের ভেতর হাজির হয়েছেন। পাক্কা বারোটা কাহিনী নিয়ে। প্রত্যেকটা গল্পই সববয়সী পাঠককে হাসতে হাসতে বেদম করে তুলবে।

আর সেই সঙ্গে সোনায় সোহাগা বিখ্যাত শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর দারুণ-দারুণ ছবি। হর্ষবর্ধন যাঁকে ছাড়া ভাবাই যায় না।